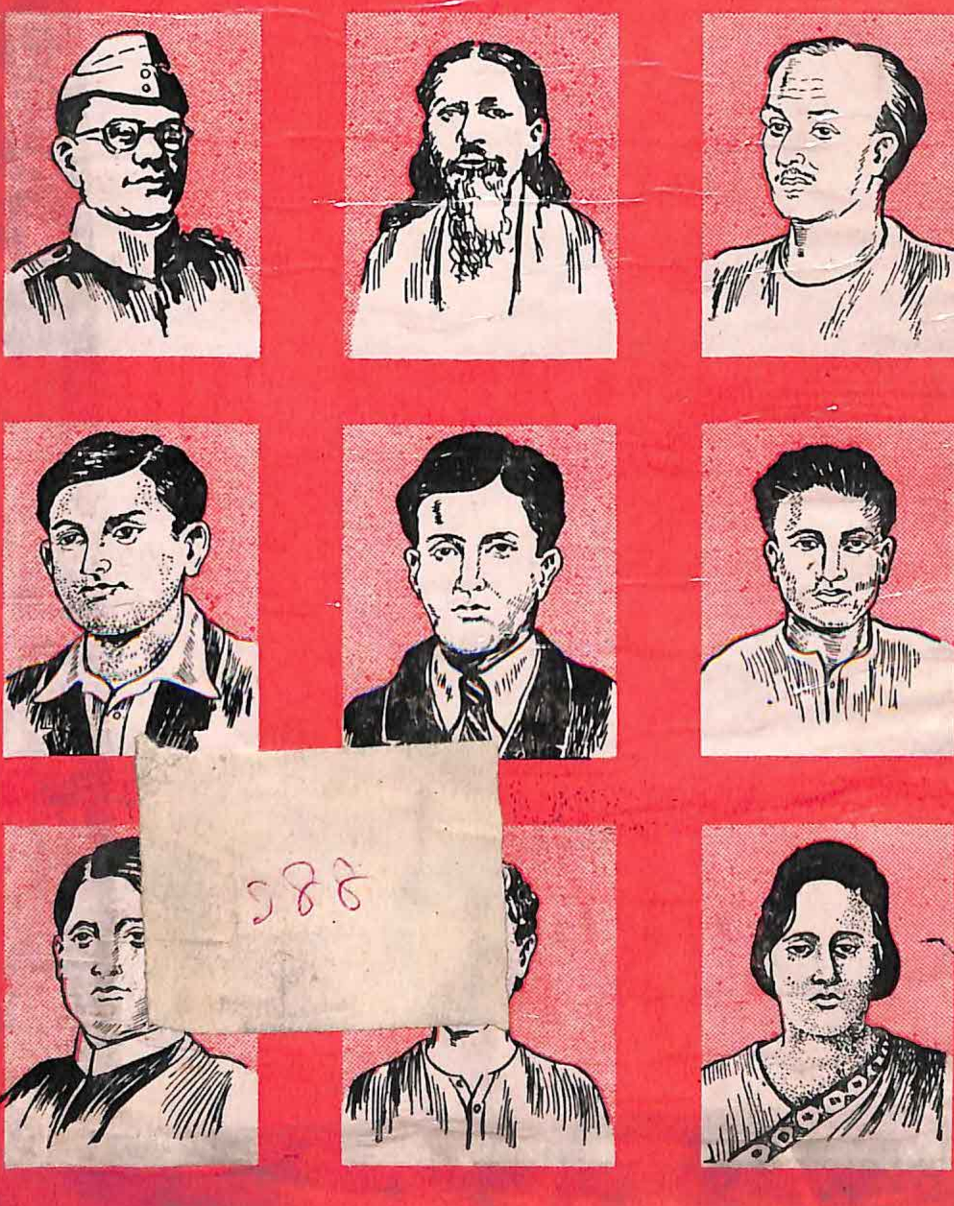
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালী

বিপ্লব তরফদার



॥ আন্তর্জাতিক যুববর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত হল ॥

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙালী

বিপ্লব তরফদার

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯.

প্রকাশক :
সুরেশ দাশ
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর—১৯৮৫

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ
ডিসেম্বর—১৯৮৭

প্রচ্ছদ ও অলঙ্কার :
বিন্দুভূষণ পাল

মূল্য : আট টাকা মাত্র

মুদ্রক :
প্রশান্ত কুমার মণ্ডল
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১/বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

॥ প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ॥

১৯৪৭ সাল, ১৫ই আগস্ট—ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। নেক ত্যাগ, অনেক রক্ত ঝরানোর পর অবশেষে লালকেল্লায় উড়ল স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা। শত-শহীদের উজ্জ্বল বলিদান, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, আর আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর মরণপণ সংগ্রামের চাপে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষ থেকে পাততাড়ি গুটোতে বাধ্য হয়েছে। অবসান ঘটেছে দুশো বছরের আগ্রাসী ঔপনিবেশিকতাবাদের।

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট এই দেশ—ভারতবর্ষ। তার স্বাধীনতা অর্জনের লড়াইয়ে স্বভাবতই অংশ গ্রহণ করেছেন ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ। ভারতবর্ষের যে ঐতিহ্য—'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'—

—তা' নতুন করে মূল্যায়িত হয়েছিল এই স্বাধীনতা যুদ্ধের রক্তাক্ত ঐক্যবোধের মাধ্যমেই। বিভিন্ন প্রদেশের নেতা আর শহীদের রক্তদানেই গড়ে উঠেছে স্বাধীন ভারতের ভিত্তি প্রস্তর।

বাংলাদেশও (অবশ্যই অবিভক্ত) পিছিয়ে থাকেনি। স্বাধীনতার লড়াইয়ে সে-ও যথাসাধ্য রক্তদান করেছে। বরং, তুল্যমূল্য বিচারে, তার অবদানই সর্বাপেক্ষা বেশি। যদিও একথা অনস্বীকার্য যে, বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের সম্মিলিত লড়াইয়ের ফলেই উদিত হয়েছে স্বাধীনতার সূর্য। তবু বাংলাদেশ, তথা বাঙালীর ভূমিকাকে আমরা স্বতন্ত্র মূল্য দিতে চাই বাঙালী কিশোর-কিশোরীদের কাছে তাদের অতীতের এবং পূর্বপুরুষদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে উপস্থাপিত করে তাদের বর্তমান মূল্যবোধের উন্নতি ঘটাতে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

ইদানিংকালের কিশোর-কিশোরীরা, যে স্বাধীন ভারতবর্ষের তারা নাগরিক সেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যে তাদেরই পূর্ব-পুরুষেরা প্রচুর রক্তক্ষরণ ও প্রাণাতিপাত ঘটিয়েছেন, সে সম্পর্কে তারা একেবারেই কৌতুহলহীন।—এই মানসিকতা সুস্থতার লক্ষণ নয়।

অভিজ্ঞতাজাত এই বোধ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা সচেষ্ট হয়েছি মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনে কয়েকজন বীর সংগ্রামীর সংগ্রাম-জীবনের কাহিনী উপস্থাপিত করতে। যার থেকে বর্তমান কালের নবীনেরা অনুভব করতে পারে তাদেরই পূর্ব-পুরুষদের রক্তে-গড়া এই স্বাধীন ভারতভূমির প্রাণ-স্পন্দনকে।

'স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙালী' গ্রন্থে উল্লেখিত এই ক'জন মাত্র বাঙালী সংগ্রামী পুরুষ ও নারীর চেষ্টায়, কিংবা স্বাধীন ভারতবর্ষের যে-কোন বিশেষ প্রদেশের একান্ত অবদান নয় ;—সে সম্পর্কে সচেতন থেকেও শুধুমাত্র কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে বেছে নিয়েছি আলোচ্য গ্রন্থের সীমিত পরিসরের কথা মনে রেখে।

তাছাড়া, সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের যে বিষাক্ত ফণাগুলি ছোবল মারতে তৎপর হচ্ছে ভারতবর্ষের অখণ্ডতা তথা শান্তি-সমৃদ্ধিকে, বিদেশী শক্তির অশুভ-চক্রান্তের সাহায্যে ভারত ভাঙ্‌বার জন্য যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, সেই বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য সুকুমারমতি নবীন-নবীনাদের ভারতবর্ষকে চিনতে হবে, জানতে হবে। আর, তা সম্ভব হ'তে পারে যদি প্রাথমিকভাবে নিজস্ব প্রদেশ ও তার ভূমিকা বিষয়ে তাদের সচেতন করা যায়।—বস্তুতঃ অন্যান্য চিন্তা-ভাবনার মত, সারা ভারতবর্ষের পটভূমিকায় বাঙ্‌লাদেশ ও বাঙালীর উজ্জ্বল ভূমিকা বিষয়ে কিশোর-কিশোরীদের সচেতন করে তুলতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার এই গ্রন্থের পরিকল্পনা।

এই গ্রন্থ-রচনায় তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে পূর্বসূরীদের বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য আমাদের নিতে হয়েছে। তাঁদের প্রতি আমাদের ঋণ অপরিমেয়। বন্ধু গৌতম ঘোষের উৎসাহ আমাদের গ্রন্থ-রচনায় ব্রতী করেছে। গৌতম ধন্যবাদের উর্ধ্বে! এই পুস্তক পাঠ করে বর্তমান যুগের কিশোর-কিশোরীদের যদি নিজেদের মনে সাহস স্বীকার করে মাতৃভূমির স্বাধীনতা-রক্ষায় সচেতন হয়, তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

গ্রন্থকার


সূচীপত্র



শহীদ ক্ষুদিরাম

[১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার হাবিবপুর গ্রামে শহীদ ক্ষুদিরাম বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ত্রৈলোক্যনাথ বসু এবং মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। কুখ্যাত ইংরাজ প্রশাসক কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগে ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। তিনি ফাঁসি মঞ্চে উৎসর্গকারী বাংলাদেশের প্রথম শহীদ।]

তখন কলকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেব। ভীষণ অত্যাচারী! সামান্য কারণে, সে ন্যায় হোক্ আর অন্যায়ই হোক্, ভারতীয়দের নির্মম হাতে শাস্তি দিয়ে থাকে। যাঁরা বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেন তাঁদের কাছে কিংসফোর্ড বড় শত্রু। তিনি রাজদ্রোহিতার অপরাধে বিপ্লবীদের কঠোর শাস্তি বিধান করতেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বিপ্লবী দল। এমন নির্মম শাসকের রক্ত চাই—কিংসফোর্ডের রক্ত চাই। কিন্তু সাহেব অতি সতর্ক হয়ে চলাফেরা করেন। কোনভাবেই তাকে সুযোগমতো পাওয়া যায় না। দুই-একবার সুযোগ এলেও কিংসফোর্ড রক্ষা পেয়ে যান। অথচ তাকে হত্যা না করলেই নয়।—এই কুখ্যাত কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য যে আঠারো বছরের নির্ভীক তরুণ যুবক মাতৃভূমির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁর নাম ক্ষুদিরাম বসু। তিনি ফাঁসির মঞ্চে উৎসর্গকারী বাংলাদেশের প্রথম শহীদ।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার হাবিবপুর গ্রামে শহীদ ক্ষুদিরাম জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ত্রৈলোক্যনাথ বসু এবং মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। সন্তান হলে মারা যায়, তাই ক্ষুদিরামের জন্ম হলে তাঁর মা আর সাহস পেলেন না তাঁকে নিজের কাছে রাখতে। এইজন্য লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী তিন মুষ্টি ক্ষুদের বিনিময়ে ক্ষুদিরামের বড় বোন অনুরূপা দেবীর নিকট তাঁকে বিক্রয় করেন। মায়ের আশা, সন্তান অপরের হলে দীর্ঘজীবন লাভ করবে। ক্ষুদের বিনিময়ে বিক্রীত হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম রাখা হয় ক্ষুদিরাম।

ক্ষুদিরামের বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন অল্প দিনের ব্যবধানে তাঁর মা ও বাবা উভয়েই মারা যান। পিতৃমাতৃহীন বালক কিছুদিন এক জ্ঞাতিভ্রাতার নিকট এবং পরে বড়দিদি অনুরূপা দেবীর নিকট মানুষ হন।

ভগ্নীপতি অমৃতলাল বসু তমলুকে বদলী হলে হ্যামিল্টন স্কুলে ভর্তি হন ক্ষুদিরাম। পড়াশোনায় তেমন মনোযোগ কখনোই তাঁর ছিল না। তবে দুরন্তপনায় তিনি সকলের সেরা। স্কুলের শিক্ষকেরা সবাই তাঁকে ভালবাসতেন। ক্ষুদিরামের ব্যবহার ও স্বভাব মিষ্টতা তাঁকে সকলের প্রিয় করে তুলেছিল। ছোটবেলা থেকেই তিনি অদম্য সাহসী ছিলেন। কোন অন্যায় দেখলে তার প্রতিবাদ না করে তিনি থাকতে পারতেন না। ১৯০৪ সালে অমৃতলাল বসু বদলী হলেন মেদিনীপুরে। ক্ষুদিরাম তখন ভর্তি হলেন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে। রাজনারায়ণ বসু সে সময়ে ছিলেন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এখানেই রাজনারায়ণ বসুর ভাইপো সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে বালক ক্ষুদিরামের পরিচয় হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ঐ স্কুলেরই শিক্ষক। এবারে উপযুক্ত শিষ্য পেলেন তাঁর উপযুক্ত গুরুর সান্নিধ্য। সতেন্দ্রনাথ বসুর প্রেরণায় দীক্ষিত হলেন ক্ষুদিরাম দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে।

অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে হত্যা করা যখন বিপ্লবীদলের গুপ্ত সমিতিতে স্থির হল তখন এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান এল ক্ষুদিরামের কাছে। সানন্দে ও পরম নির্ভীকতায় ক্ষুদিরাম এই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। গুরু সত্যেন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়ে আঠারো বছরের তরুণ ক্ষুদিরাম রওনা হয়ে এলেন কলকাতার মুরারীপুকুর বাগানে। সেখান থেকে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমারের নির্দেশে ক্ষুদিরাম ও সঙ্গী প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে এলেন। এর মধ্যে কলকাতায় কিংসফোর্ডের নিরাপত্তার অভাবের কথা চিন্তা করে ইংরাজ সরকার তাকে মজঃফরপুরে জেলা জজ করে পাঠিয়ে দেয়। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে এসে একটি ধর্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তাঁরা কিংসফোর্ড সাহেবের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা শুরু করেন। প্রতীক্ষা করতে থাকেন সুযোগের অপেক্ষায়।

অবশেষে একদিন তাঁদের কাঙ্ক্ষিত সুযোগ এল। সেদিন তারিখ ছিল ৩০শে এপ্রিল, ১৯০৮ সাল। কিংসফোর্ড সাহেব ফিটন গাড়ী করে ক্লাবে গেছেন, ফিরবেন শীগ্‌গীরই। এই সুযোগকে কাজে লাগাতেই হবে। সাহেব যখন ক্লাব থেকে ফিরবেন তখনই হানতে হবে চরম আঘাত। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী দুজনেই মনঃস্থির করে পথের পাশে অন্ধকারে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে রইলেন। একজনের হাতে বোমা, অন্য জনের কাছে পিস্তল। অনতিবিলম্বে ফিটন গাড়ীর চাকার শব্দে তাঁরা সচকিত হয়ে ওঠেন। এইতো সেই গাড়ী! মুহূর্তকাল বিলম্ব নয়। ক্ষুদিরামের নিক্ষিপ্ত বোমা বিকট শব্দ করে ফাটল আর সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে গাড়ীটি জ্বলে উঠল।—কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টাই বৃথা। সেই গাড়ীতে কিংসফোর্ড ছিলেন না, ছিলেন দুজন ইংরেজ মহিলা। কেনেডি সাহেবের স্ত্রী ও কন্যা।

এদিকে এ খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আততায়ীকে ধরার জন্য পুলিশ সচেষ্ট হয়ে উঠল।

ওয়াইনী রেলস্টেশন মজঃফরপুর থেকে চব্বিশ মাইল দূরে।

রাত্রি শেষ প্রহর। দুই তরুণ, ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ছুটে চলেছেন রেললাইন ধরে। আত্মগোপনের জন্য সেই থেকে ছুটে চলেছেন একটানা। ক্লান্তি ও অবসাদে দুজনের গতি শ্লথ হয়ে এসেছে প্রায়। বিশ্রাম নেবার জন্য তাঁরা স্টেশনের কাছাকাছি একটি আমবাগানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন ভোর হয়ে এসেছে। দুজনেই ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর। ক্ষুদিরাম স্টেশনের বাইরে মুদির দোকান থেকে খাবার সংগ্রহ করতে গেলেন। এমন সময়ে অতর্কিতে দুজন পুলিশ কর্মচারী সন্দেহবশে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করেন ক্ষুদিরাম। কিন্তু হায়! ধস্তাধস্তি করেও ক্ষুদিরাম তাদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না। তাছাড়া ধস্তাধস্তির ফলে তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে পড়ে পিস্তল ও কার্তুজ। ১৯০৮ সালের ১লা মে গ্রেপ্তার হলেন ক্ষুদিরাম। ওদিকে সঙ্গীর অবস্থা লক্ষ্য করে সরে পড়লেন প্রফুল্ল চাকী। তবে মোকামা স্টেশনে তিনি ধরা পড়ে যান। কিন্তু পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করার আগে তিনি নিজে পিস্তলের গুলিতে জীবনদীপ নির্বাপিত করেন। প্রফুল্ল চাকী এদেশের প্রথম শহীদ।

আঠারো বছর বয়সী বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরামের বিচারের নামে প্রহসন শুরু হয়। বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। ১৩ই জুন অকুতোভয় বিপ্লবী বীর হাসিমুখে দণ্ডাজ্ঞা শোনেন। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি।

১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট। মজঃফরপুর জেল গেটের সামনে লোকে লোকারণ্য। ভোর ছটায় ক্ষুদিরামের ফাঁসি হবে। যথাসময়ে দৃঢ়পদক্ষেপে বালক বীর এগিয়ে যান ফাঁসি মঞ্চের দিকে। দৃপ্তকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণের মত উচ্চারণ করেন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। তারপর হাসতে হাসতে ক্ষুদিরাম নিজহাতে ফাঁসির রজ্জু নিজ গলায় পরে নেন। বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে অনুভব করলেন মাতভূমির স্বাধীনতা জীবনের থেকে কম মূল্যবান নয়।



নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু

[পুরুষসিংহ সুভাষচন্দ্র বসু ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী উড়িষ্যার কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কটকের প্রখ্যাত উকিল জানকীনাথ বসু। সুভাষচন্দ্র পিতার ইচ্ছানুসারে আই. সি. এস পড়তে বিলাতে যান এবং ১৯২০ সালে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু স্বাধীনচেতা সুভাষ ইংরাজ সরকারের অধীনে সরকারী চাকরী না করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর পরিচালনায় 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট তাইহোকু বিমানবন্দরে এক বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র প্রাণ হারান। তবে তাঁর এই মৃত্যু সংবাদ অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেন নি।]

১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারী। মধ্যরাত্রি। হাওড়া পুলের উপর দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে একটা কালো রং-এর মোটর গাড়ি। পরদিন সূর্য ওঠার আগেই ধানবাদ এবং রাত্রে বাংলা-বিহার সীমান্তে অবস্থিত গোমো স্টেশনে গাড়িটা গিয়ে পৌঁছোল। —মাথায় ফেজ বাঁধা, আঁট-সাঁট পায়জামা ও শেরওয়ানী পরিহিত এক লম্বা চওড়া সুপুরুষ সেই গাড়ি থেকে নেমে ত্রস্ত গতিতে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেনের কামরায় উঠে বসলেন। ট্রেনটির গন্তব্যস্থল ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত শহর পেশোয়ারে। যথা সময়ে ট্রেনটি পেশোয়ারে পৌঁছোল। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে সেই লোকটি আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুলে গিয়ে পৌঁছোলেন।

কেউ বিন্দুমাত্র বুঝতে পারল না, সেদিন বীর বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটিশ পুলিশের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে, জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশে পাড়ি দিলেন ভারতবর্ষের বাইরে মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করার সংকল্প নিয়ে।

১৯৪১ সালের ২৮শে জানুয়ারী। খবর বেরুল, রহস্যজনকভাবে সুভাষচন্দ্র নিরুদ্দেশ হয়েছেন, তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। ব্রিটিশ সরকার ভীত হয়ে উঠলেন। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ঠিক এই সময়ে সুভাষচন্দ্রের মত বিপ্লবী নেতা ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টির বাইরে থাকা তাদের পক্ষে ভয়ানক বিপজ্জনক।—কিন্তু ততদিনে সুভাষচন্দ্র কাবুলে উত্তমচাঁদ নামে এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন।

এই পুরুষসিংহ সুভাষচন্দ্র বসু ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী উড়িষ্যার কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কটকের প্রখ্যাত উকিল জানকীনাথ বসু। সেখানকার মিশনারী স্কুলে সুভাষচন্দ্রের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। পরে র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯১৪ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন।—এই কলেজে থাকাকালীন, একদিন এমন একটি ঘটনা ঘটে, যার ফলে সুভাষচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাড়তে হয়।

—ই. এফ. ওটেন নামে এক ইংরাজ অধ্যাপক ইতিহাস পড়াতেন। এই ইংরাজ অধ্যাপক ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষ ও অবজ্ঞার মনোভাব পোষণ করতেন। একদিন পড়ানোর সময় ভারতীয় নারীদের প্রতি অবজ্ঞা এবং অপমানসূচক মন্তব্য করলে সুভাষচন্দ্র উত্তেজিত হয়ে প্রবল প্রতিবাদ জানান। পরে বাধ্য হয়ে ওটেন তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করেন। —কিন্তু ভারতীয় ছাত্র হয়ে সুভাষচন্দ্রের এত বড় স্পর্ধা! ইংরাজ সরকার এই দুঃসাহসকে ক্ষমা করলেন না। কলেজ থেকে সুভাষকে তাড়িয়ে দিলেন।

পরে সুভাষচন্দ্র স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে ১৯১৯ সালে দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। পিতার ইচ্ছানুসারে সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস. পড়ার জন্য বিলাতে যান এবং ১৯২০ সালে আই. সি. এস. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন।— তখন ভারত জুড়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে। সুভাষের মনে প্রাণে ছিল গভীর স্বদেশানুরাগ। তাই লোভনীয় সরকারী চাকুরীর মায়া ত্যাগ করে, দেশে ফিরে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিলেন।

বাংলাদেশে তখন এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর প্রধান সহযোগী হয়ে উঠলেন। ১৯২১ সালে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকেও ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার করলেন।

জেল থেকে মুক্তি লাভের পর সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু পরিচালিত 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সহকারী-সম্পাদকের কাজে যোগ দেন এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করার জন্য সচেষ্ট হন। ১৯৩০ সালে আবার তিনি গ্রেপ্তার হলেন। এবারে ইংরাজ শাসকেরা তাঁকে ভারতের কারাগারে রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারল না। তাই সুভাষচন্দ্রকে তারা ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ের কারাগারে আবদ্ধ করে রাখলো। বারংবার কারাবাসের ফলে সুভাষচন্দ্রের শরীর ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ে। জনগণের চাপে অনেকটা বাধ্য হয়েই ব্রিটিশ সরকার চিকিৎসার জন্য সুভাষকে মুক্তি দেয়।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন কোন্ পথে, কোন্ নীতি অবলম্বন করে চলবে—এই বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতভেদ হওয়ার ফলে তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েও শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ছেড়ে চলে আসেন। সুভাষচন্দ্র চান আপোষহীন সংগ্রাম, গান্ধীজীর নমনীয় নীতি তাঁর পছন্দ নয়। সুভাষের দৃঢ় বিশ্বাস, বিদেশী শাসকের শিকড় একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই উপড়ে ফেলা সম্ভব।

এরপর তিনি 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার নামানুসারে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি দল গঠন করেন। এতে ইংরাজ সরকার নতুন করে ত্রাস্ত হয়ে উঠল সুভাষ সম্পর্কে এবং ১৯৪০ সালে পুনরায় তাঁকে গ্রেপ্তার করল। এবার এলগিন রোডে নিজের বাড়ীতেই সুভাষচন্দ্র অন্তরীণ হয়ে রইলেন। বাড়ীর চারদিকে পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি। কড়া পাহারা।

কিন্তু এভাবে ঘরে আটক অবস্থায় থাকলে তো আর সুভাষচন্দ্রের চলবে না। তাই পরিকল্পনা স্থির করে ফেললেন এখান থেকে পালিয়ে যাবার। ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারী জিয়াউদ্দিন নাম ধারণ করে ছদ্মবেশে সুভাষচন্দ্র পালিয়ে গিয়ে ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে কাবুলে পৌঁছোলেন। সেখান থেকে জার্মানী এবং জার্মানী থেকে জাপান হয়ে সিঙ্গাপুরে চলে যান। সিঙ্গাপুরে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ইচ্ছানুযায়ী সুভাষচন্দ্র 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজের' নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি 'আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর' প্রত্যেক সেনার নিকট অতি প্রিয় হয়ে ওঠেন এবং তখন থেকেই সুভাষচন্দ্র সকলের নিকট 'নেতাজী' হয়ে ওঠার সম্মান লাভ করেন। এই দায়িত্বভার গ্রহণ করার প্রায় চার মাস পরে, ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে 'অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকার' প্রতিষ্ঠা করলেন। সুভাষচন্দ্র হলেন তাঁর রাষ্ট্রাধিনায়ক। এর কয়েকদিন পরেই এই অস্থায়ী সরকার ইংরাজ ও আমেরিকার সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। জাপানী শক্তির সাহায্যে তাঁদের অভিযান শুরু হল। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী ক্রমে ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করে আসামে প্রবেশ করল। মণিপুর এবং কোহিমা তারা দখল করে নিল। ১৯৪৫ সালের ১৮ই মার্চ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। এদিন আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের মাটিতে প্রথম ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সুভাষচন্দ্রের বুকে তখন মুক্তির আনন্দ। আরও এগিয়ে যেতে হবে। নেতাজীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো 'দিল্লী চলো।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিল্লী অভিযান আর সম্পূর্ণ হয়ে উঠল না। কারণ ভীষণ বর্ষা শুরু হওয়ার ফলে সৈন্যবাহিনীর জন্য রসদ সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। অনাহারে, ক্লান্তিতে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত। এর মধ্যে আবার নতুন উপদ্রব শুরু হল, অনেক সৈন্য আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাদের চিকিৎসার ঔষধ নেই, পথ্য নেই।—ওদিকে প্রবল বেগে ইংরাজ ও আমেরিকার সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসছে। অন্যদিকে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, জাপান প্রত্যেকেই সন্ধি করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সুভাষচন্দ্র বসু কি করবেন! তাঁর স্বপ্নের দিল্লী অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ। শত্রুপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে! এ যে তাঁর কল্পনার অতীত। পরিস্থিতির চাপে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই, কিন্তু তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করার আদেশ দেবেন কি করে? —তিনি যে নেতাজী!— তাই মেজর জেনারেল ভোঁসলের কাছে আত্মসমর্পণের নির্দেশ রেখে সুভাষচন্দ্র রওনা হলেন জাপানের পথে।

এই জাপান যাত্রাই সুভাষের শেষ যাত্রা। ১৯৪৫ সালের ২৩শে আগস্ট নিউজ এজেন্সীর খবরে জানা গেল, সুভাষচন্দ্র ১৮ই আগস্ট তাইহোকু বিমান বন্দরে বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন।— নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ সেদিন অধিকাংশ ভারতীয় বিশ্বাস করতে পারেননি। আজও অনেকের মনে সে সম্বন্ধে সন্দেহ রয়ে গেছে। তবে তিনি জীবিত বা মৃত যাই থাকুন না কেন, আমাদের হৃদয়ে তাঁর স্মৃতি অমলিন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র বসু একজন নক্ষত্র বিশেষ।



মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু

[১৮৮০ সালে বর্ধমান জেলার কালনা স্টেশনের সন্নিকটে সুবলদহ গ্রামে রাসবিহারী বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বিনোদবিহারী বসু। তিনি দশ-বারোটি ভারতীয় ভাষা, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা উত্তমরূপে জানতেন।—১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যখন সমগ্র দেশ আলোড়িত তখন রাসবিহারী বসু এই আন্দোলনে যোগ দেন এবং পরবর্তীকালে বৃহৎ আন্দোলনে তিনি অংশ গ্রহণ করেন।—'আজাদ হিন্দ বাহিনী' গঠন করে রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রের হাতে এই বাহিনীর সম্পূর্ণ দায়িত্বভার অর্পণ করেন।—১৯৪৫ সালের ২১শে জানুয়ারী স্বাধীন ভারতের স্বপ্নে বিভোর মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর মৃত্যু হয়।]

১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। উৎসবমুখর দিল্লী। যেদিকে তাকানো যায় শুধু আলো আর পতাকার সমারোহ।—ইংরাজ সরকার ভাবলেন কলকাতায় রাজধানী থাকাটা মোটেই নিরাপদ নয়। বাংলার মৃত্যুভয়হীন বেপরোয়া তরুণদের আর বিশ্বাস নেই। সুতরাং ইংরাজ সরকার ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে তুলে দিল্লীতে নিয়ে গিয়ে নিজেদের নিরাপদ করতে চাইলেন। সে কারণেই দিল্লীতে এত বড় উৎসবের আয়োজন।

প্রচুর অর্থব্যয়ে বিরাট শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমায় বেরিয়েছে। এই রাজকীয় শোভাযাত্রার একেবারে প্রথম সারিতে রয়েছেন হস্তিপৃষ্ঠে সস্ত্রীক বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ। শোভাযাত্রা শেষ হলে বড়লাট হার্ডিঞ্জ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে। বড়লাট হার্ডিঞ্জের পেছনে রয়েছেন প্রধান প্রধান রাজকর্মচারী, দেশীয় রাজা-মহারাজা ও ইংরাজ শাসকের মোসাহেবের দল। অগণিত নারী-পুরুষ রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে দেখছে এই অপূর্ব শোভাযাত্রা। কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। রাস্তা ছাপিয়ে জনতার ভীড় উপ্‌ছে পড়েছে পথের দু'ধারের বাড়ীগুলির ছাদে, বারান্দায়। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের তিনতলার বাড়ীর ছাদে ও বারান্দায় একই চিত্র। পুরুষেরা সব ভীড় করেছে ব্যাঙ্ক বাড়ীর একতলা ও তিনতলাতে। দোতলার দর্শকেরা সবাই মহিলা। তাদের ভীড়ে এক সুবেশা তরুণী। মন ভোলানো রূপ তার। নাম লীলাবতী।

ততক্ষণে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে ব্যাঙ্ক বাড়ীর নীচে দিয়ে। ঠিক তখনই সমগ্র রাজপথটা থরথর করে কেঁপে উঠল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে। শুরু হ'ল চারদিকে আর্তনাদ। সবাই প্রাণ ভয়ে ছুটছে। একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা। ওদিকে বড়লাটের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। বোমার আঘাতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তবে এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেলেন হার্ডিঞ্জ সাহেব।

আক্রোশে ফেটে পড়ল শাসক সম্প্রদায়। এখানেও বিপ্লবীদের শ্যেন দৃষ্টি। খুঁজে বের করতেই হবে এই অপকর্মের নায়ককে।

কিন্তু ততক্ষণে বোমা নিক্ষেপকারী পৌঁছে গেছেন নিরাপদ স্থানে, যেখানে তাঁর গুরু ও নির্দেশক রাসবিহারী বসু অধীর আগ্রহে বসে আছেন। তাঁর পরিকল্পনা সার্থক। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছেন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ। কিন্তু ইংরাজ সরকারকে তো বুঝিয়ে দেওয়া গেল তাদের কাছে শুধু দিল্লী কেন ভারতবর্ষ আর নিরাপদ নয়।— রাসবিহারী বসু বুকে জড়িয়ে ধরলেন তরুণ বিপ্লবীকে। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী তরুণ যুবক বসন্ত বিশ্বাস ষোড়শী তরুণীর বেশে, লীলাবতী নাম ধারণ করে হার্ডিঞ্জকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন।

রাসবিহারী বসুর মত এত বড় বিপ্লবী বাংলাদেশে খুব কম

জন্মেছেন। আমৃত্যু তিনি মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করে গেছেন। ১৮৮০ সালে বর্ধমান জেলার কালনা স্টেশনের সন্নিকটে সুবলদহ গ্রামে রাসবিহারী বসুর জন্ম হয়। পিতার নাম বিনোদবিহারী বসু। রাসবিহারী অতি শৈশবেই মাকে হারাণ। পরবর্তী সময়ে, রাসবিহারী তখন বালক, বিনোদবিহারী বসু গ্রাম ছেড়ে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে এসে বসবাস শুরু করেন। রাসবিহারী বসুর পিতাকে চাকরির সূত্রে বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হতো। মাতৃহারা বালক রাসবিহারী পিতার সঙ্গেই বেশীর ভাগ থাকতেন। ফলে, বাল্যকালেই তিনি দশ-বারোটি ভারতীয় ভাষা শিখে ফেলেন। পরে কলকাতার মর্টন স্কুলে ও চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজে পড়াকালীন ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা উত্তমরূপে শিখে নেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যখন সমগ্র দেশ আলোড়িত, তখন রাসবিহারী বসু এই আন্দোলনে যোগ দেন। মানিকতলা মুরারীপুকুর বাগান তল্লাশীর সময় রাসবিহারীর দু'খানা চিঠি ধরা পড়ে যাওয়ায় বিপদ আশঙ্কা করে তিনি ডেরাডুনে চলে যান। সেখানে শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন। পরে বন-বিভাগে চাকরি নেন। এই চাকরিতে রাসবিহারী প্রচুর টাকা উপার্জন করতেন। নিজের জন্য সামান্য কিছু টাকা রেখে প্রায় সবটাই দরিদ্রের সেবায় ও স্বদেশী আন্দোলনের কাজে ব্যয় করতেন।

দিল্লীতে বড়লাট হার্ডিঞ্জ সাহেবকে হত্যা-চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ার পর রাসবিহারী বসু লাহোরের হাকিম গর্ডন সাহেবকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর নির্দেশমত বসন্ত গুপ্ত নামে এক যুবক লরেন্স পার্কে আবর্জনার আড়ালে একটি বোমা লুকিয়ে রেখে আসেন। কারণ গর্ডন সাহেব আসবেন পার্কে। তারিখটা ছিল ১৯১৩ সালের ১৩ই মে।—কিন্তু এখানেও সফল হলেন না রাসবিহারী বসু। গর্ডন সাহেব চলে যাবার পর বোমাটি ফাটে।

'অল্পদিনের ব্যবধানে একই রকম দুটি ঘটনা ঘটে যাওয়াতে

পুলিশবাহিনী আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ইংরাজ সরকার ঘোষণা করেন, আততায়ীকে যে ধরিয়ে দেবে সে প্রচুর টাকা পুরস্কার পাবে। বিশেষ করে পরিকল্পনাকারী নেতা রাসবিহারীকে।

কিন্তু কোথায় রাসবিহারী! ভারতের প্রতিটি ভাষায় তিনি পারদর্শী। আর সব থেকে বড় কথা যিনি মুহূর্তে ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারতেন। তাঁকে ধরা কি মুখের কথা?

পুলিশের তৎপরতা সত্ত্বেও রাসবিহারী সুদক্ষ শিল্পীর মতো ছদ্মবেশ ধারণ করে আত্মগোপন করতে থাকলেন কখনো লাহোরে, কখনো ক'লকাতায় কিংবা কাশীতে।

এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল! রাসবিহারী কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। মাথায় তাঁর ভিন্ন পরিকল্পনা।—ইয়োরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ইংরাজ এখন যুদ্ধে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে ব্যস্ত। সুতরাং এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে।

কাশীতে আত্মগোপন করে থেকে ততদিনে রাসবিহারী 'যুব সংঘের' নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। এই সংঘের উদ্দেশ্য হল ইংরাজদের বিরুদ্ধে দেশী সৈন্যদলকে খেপিয়ে তোলা। ইংরাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গেলে প্রয়োজন ব্যাপক অস্ত্রশস্ত্র। সে অস্ত্র রয়েছে সেনাবাহিনীর হাতে। তাই তাদেরকে দলে টানতে হবে।

অদ্ভুত সাড়া পাওয়া গেল প্রতিটি সেনানিবাস থেকে। ভারতের এই মুক্তি-সংগ্রামে দেশীয় সৈন্যবাহিনী ইংরাজ সরকারের পদলেহী হয়ে আর থাকবে না।

এই সময় প্রবাসী ভারতীয়রা মিলে আমেরিকার কালিফোর্নিয়া শহরে গঠন করেন সদর পার্টি। এই পার্টির কয়েকজন সদস্য রাসবিহারীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। বিদেশ থেকে প্রচুর সংখ্যক বিদ্রোহী ভারতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। উপযুক্ত সময়ে তাঁরাও ঝাঁপিয়ে পড়বেন সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে।

ইতিমধ্যে রাসবিহারী বসুর আহ্বানে সাড়া মিলেছে বর্মা, মালয় ও সিঙ্গাপুরে অবস্থিত সৈন্যবাহিনীগুলি থেকে। সবাই আজাদীর জন্য সংগ্রাম করতে উন্মুখ।

১৯১৫ সাল। ইউরোপ জুড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা বেজে উঠেছে। আর দেরী নয়। রাসবিহারী এই সুযোগকে কাজে লাগাতে চান। তাই কালবিলম্ব না করে ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহের দিন ধার্য করলেন।

বিরাট সংগঠন। পেশোয়ার থেকে শুরু করে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত। বৃহৎ পটভূমিকা বিস্তৃত এবারকার বিদ্রোহ।

প্রতিটি সেনার জন্য ইউনিফর্ম প্রস্তুত। যুদ্ধ ঘোষণার খসড়াও তৈরি। স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠনের পরিকল্পনাও প্রস্তুত। মূল শিবির হবে লাহোরে। সেখানকার দায়িত্বে থাকবেন স্বয়ং রাসবিহারী বসু। এবারে শুধু নির্দিষ্ট দিন, ২১শে ফেব্রুয়ারীর জন্য অপেক্ষা।

কিন্তু হায়। কৃপাল সিং নামে এক ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রে সমস্ত পরিকল্পনার কথা পুলিশ জানতে পারে। অতর্কিত হানায় একে একে ধরা পড়তে থাকেন বিপ্লবীরা। বাধা দেবার সময়টুকুও পান না।—রাসবিহারী শোকস্তব্ধ। তাঁর সমস্ত স্বপ্ন, পরিকল্পনা, পরিশ্রম এভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। আশাভঙ্গের বেদনায় বিপর্যস্ত রাসবিহারী চলে এলেন বাংলা দেশে। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যায় দিল্লী ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। তেইশজন বিপ্লবীর ফাঁসী ও সাতাশজনের দ্বীপান্তর হয়।

এদিকে পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাসবিহারীকে ধরার জন্য। তার সহযোগীরা প্রায় সবাই ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। তাঁদের মধ্যে অনেকের প্রাণদণ্ড ও দ্বীপান্তর হয়েছে। স্বভাবতই রাসবিহারী হতোদ্যম হয়ে পড়েন।—কিন্তু তাঁকে থেমে পড়লে চলবে না। যে করেই হোক স্থির লক্ষ্যে পৌঁছোতেই হবে। দেশ

মাতা যে সতৃষ্ণ নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন।—কিন্তু পুলিশের দৃষ্টির আড়ালে কি ভাবে থাকা যাবে! এখানে থাকলে আজ হোক, বা কাল হোক, ধরা তাঁকে পড়তেই হবে। পরিস্থিতি বিচার করে রাসবিহারী স্থির করলেন দেশের বাইরে গিয়ে আন্দোলন নতুন করে শুরু করতে হবে।

১৯১৫ সালের ১২ই মে মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু 'সানুকীমারু' নামক জাহাজে জাপানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একান্ত সচিব রাজা পি. এন. ঠাকুর পরিচয়ে।

বহু বাধা-বিপদ অতিক্রম করে রাসবিহারী জাপানে এসে নতুন সমস্যায় পড়লেন। অনেক আশা নিয়ে এসেছেন এখানে, সব কি বিফলে যাবে!—প্রথম মহাযুদ্ধে জাপান মিত্রশক্তির সহায়ক হয়েছিল। তাই যুদ্ধ চলাকালে জাপান ইংরাজ-বিরোধী কোন ভূমিকা গ্রহণ করবে না।—তাহলে রাসবিহারী কার কাছে সাহায্যের হাত পাতবেন? ভীষণ সমস্যায় পড়লেন।—এর মধ্যে জাপানে অবস্থিত গুপ্তদল 'ব্ল্যাক ড্রাগন সমিতি'র দলনায়ক প্রখ্যাত দার্শনিক মিৎসুয়ো তোয়ামার সাথে পরিচিত হয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য সাহায্যপ্রার্থী হলেন। তোয়ামা তার আহ্বানে সাড়া দিলেন। তোয়ামার ইচ্ছানুসারে রাসবিহারী 'ব্ল্যাক ড্রাগন সমিতি'র গুপ্ত সভায় বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে দলের সদস্যরা সকলে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হলেন। এদের সাহায্য নিয়ে রাসবিহারী প্রতিষ্ঠা করলেন 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ'।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল। প্রবাসী ভারতীয়দের সহায়তায় রাসবিহারী গঠন করলেন 'আজাদ হিন্দ্ বাহিনী'। তখন দিন-রাত পরিশ্রমের ফলে ও বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত রাসবিহারীর শরীর ক্রমশঃ ভেঙে পড়ছিল। তাই তিনি খুঁজছিলেন একজন উপযুক্ত সহযোগীকে। পেয়েও গেলেন।—এই সময়ে জার্মান হয়ে জাপানে এসে পৌঁছেছেন সুভাষচন্দ্র বসু।

রাসবিহারী কোনরকম দ্বিধা না করে সানন্দে সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করলেন সুভাষের উপরে। তিনি নিয়োগ করলেন সুভাষচন্দ্রকে 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজের' সর্বাধিনায়ক রূপে।

১৯৪৪ সালে রাসবিহারী বসু গুরুতর অসুস্থ হয়ে শয্যা গ্রহণ করেন। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে তখনো তিনি প্রতিদিন খবর রাখার চেষ্টা করেন তাঁর রক্ত দিয়ে গড়া 'আজাদ হিন্দ্ বাহিনী' কোথায়, কতদূর অগ্রসর হ'তে সক্ষম হ'ল। ক্রমশঃ ভারতে প্রবেশ করে— 'আজাদ হিন্দ্ বাহিনী' মণিপুর অধিকার করেছে,—এই খবরও যথা সময়ে পেলেন অসুস্থ রাসবিহারী বসু। রোগে জীর্ণ, উঠে বসার শক্তি নেই—তবুও তিনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন। চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল।—আর দেরী নেই। তাঁর আরাধ্য স্বাধীনতা-সংগ্রাম সফল হ'তে চলেছে। ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হবে।—কিন্তু না! আবার ব্যর্থতা।—জাপান এই সময় তার প্রতিশ্রুতি পালনে সমর্থ হ'ল না। পিছিয়ে আসতে হ'ল 'আজাদ হিন্দ্ বাহিনী'কে —এই মর্মান্তিক খবর রাসবিহারী আর সহ্য করতে পারলেন না। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২১শে জানুয়ারী স্বাধীন ভারতের স্বপ্নে বিভোর মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন।—স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস থেকে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসে পড়ল।



বিপ্লবী দীনেশগুপ্ত

[বিক্রমপুরের যশোলিঙ্গ গ্রামের সতীশ গুপ্তের পুত্র দীনেশ গুপ্ত। ১৯১১ সালের ৬ই ডিসেম্বর তাঁর জন্ম হয়। বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন দীনেশ গুপ্ত। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 'রাইটার্স বিল্ডিং' অভিযান বলে যে দুর্ধর্ষ অভিযানের কথা বর্ণিত আছে, সেই অভিযানের নেতা বিনয় বোসের অন্যতম সহযোগী ছিলেন দীনেশ গুপ্ত। ১৯৩১ সালের ৬ই জুলাই বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয়।]

১৯৩১ সালের ৬ই জুলাই। আলিপুর জেলে সেদিন সাজ-সাজ রব। সেপাই থেকে বড় অফিসার—সকলেই ব্যস্ত। নির্দিষ্ট মুহূর্তটির জন্য তাদের অধীর অপেক্ষা। আগামীকাল ভোরে এক তরুণ স্বাধীনতা-সংগ্রামীর ফাঁসি হবে।—বয়সে তরুণ হ'লে কি হবে, আসলে এই ফাঁসীর আসামীটি যেন বাঘের বাচ্চা! তাই আলিপুর জেলের সব কর্মীরাই সাবধান। বলা যায় না শেষ মুহূর্তে আবার যদি কোন কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে। সুতরাং সাবধান হওয়া ভাল। তাই আলিপুর জেলে অসংখ্য পুলিশ-সেপাই থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত তিনশো সশস্ত্র পুলিশ আনা হয়েছে কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে।

যে তরুণ বিপ্লবীর জন্য আলিপুর জেলের অভ্যন্তরেও এত সতর্কতা, তার নাম দীনেশ গুপ্ত। বিক্রমপুরের যশোলিঙ্গ গ্রামের সতীশ গুপ্তের পুত্র দীনেশ গুপ্ত। ইংরাজ শাসকগোষ্ঠীর নিকট এক ভয়ঙ্কর ত্রাস। এই বীর সন্তানের জন্ম হয় ১৯১১ সালের ৬ই ডিসেম্বর।

দীনেশ অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এক বেপরোয়া যুবক। পেশীবহুল স্বাস্থ্য। উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি। বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডল। ইংরাজ শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর বুকে তীব্র ঘৃণা।

তখন সমগ্র দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে। কেউ আর বিলিতি দ্রব্য কিনবে না, ব্যবহার করবে না। সারা দেশের বিলিতি দ্রব্যের দোকানগুলির সামনে পিকেটিং বসেছে। পিকেটিং-এ যোগদান করেছে অসংখ্য স্বদেশানুরাগী যুবক-যুবতীবৃন্দ।

ঢাকা শহরেও জোর পিকেটিং চলেছে। বিখ্যাত বিলিতি মদের দোকান 'রায় কোম্পানী'র সামনে অগণিত ছেলে-মেয়ে জমা হয়েছে। বিলিতি মদ যারা কিনতে আসছে, তাদের বুঝিয়ে বলছে, বিলিতি মদ না কেনার জন্য।

এ খবর পেয়ে শাসক সম্প্রদায় ক্ষেপে উঠল। বিলিতি দ্রব্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন!—তা'হলে যে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা যাবে না। সুতরাং এদেরকে জব্দ করতে হবে। শসস্ত্র পুলিশ নিয়ে ছুটে এলেন কুখ্যাত পুলিশ সুপার মিঃ হড্‌সন।

পিকেটাররা নির্বিকার। কেউ একটুও ভয় পেল না।—বিলিতি দ্রব্য কেনা-বেচার মধ্য দিয়ে আমাদের অর্থ বিদেশীদের হাতে তুলে দেব না। দেশের অর্থ দেশেই থাকবে।—পুলিশকে দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে পিকেটাররা জনগণকে বিলিতি দ্রব্য না কেনার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন।

এতবড় দুঃসাহস এদের! পুলিশ সুপার মিঃ হড্‌সনের সামনে বিলিতি দ্রব্য বর্জনের প্ররোচনা—তবে রে! হিংস্র নেকড়ের মত ক্ষিপ্রতায় ও ক্রোধে হড্‌সন একটি ছেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠি উঁচিয়ে ধরলেন।

এমন সময় সাইকেলে করে দীনেশ গুপ্ত সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই দৃশ্য দেখে সাইকেল থেকে নেমে এগিয়ে এসে বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠলেন হড্‌সনকে উদ্দেশ্য করে।

—'স্টপ ! ত্যাটস্ নান অফ ইওর বিজনেস্ টু বীট হিম।'

—হোয়াট ?

হড্‌সন চিৎকার করে উঠলেন। কার এত বড় স্পর্ধা যে তার মুখের সামনে কথা বলে।

দীনেশ ইংরেজীতে আবার দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন—'থাম ! তোমার কোন অধিকার নেই ওকে মারার।'

রাগে, অপমানে, ক্ষোভে হড্‌সন উন্মত্তের মত রিভলভার তুলে হুঙ্কার ছাড়লেন –

'সরে যাও। না হলে আমি তোমাকে গুলী করব।'

কিন্তু হড্‌সন জানে না কাকে গুলী করার ভয় সে দেখাচ্ছে। এ যে বাংলার বীর সন্তান দীনেশ গুপ্ত।—সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে বুক পেতে দিলেন দীনেশ—'তুমি যদি কাপুরুষ না হও, তাহলে এখনই গুলী করো আমাকে।'

চমকে উঠলেন পুলিশ সুপার হড্‌সন। বলে কি ! এত সাহস সে বুকে ধরে ! এ যে আসল কেউটের বাচ্চা।

—শুধু একবারই নয়। দীনেশের এমন দুঃসাহসের পরিচয় পাওয়া গেছে অসংখ্যবার।

একবার বিক্রমপুরের বাজারে পাওয়া গিয়েছিল দীনেশ গুপ্তের দুঃসাহসের পরিচয়।

বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স-এর সদস্যদের কাছে প্রতিদিন মার্চ করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। এতে শরীরও ঠিক থাকে, আবার বিভিন্ন গ্রাম এবং লোকজনের সঙ্গেও পরিচিত হওয়া যায়। সেদিন দীনেশ গাঁয়ের পথ দিয়ে মার্চ করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে। যখন তাঁরা বিক্রমপুরের বাজারের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন, তখন সহসা রব উঠল—ডাকাত ! ডাকাত ! স্বদেশী ডাকাত !

বাজারের পাশেই থানা। ডাকাত চীৎকার শুনে দারোগাবাবু

ছুটে এলেন সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে। মুহূর্তের মধ্যে দীনেশ ও তাঁর সঙ্গীদের পুলিশ বাহিনী ঘিরে ফেলল।—দীনেশ এই ধরনের ঘটনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু ঘাবড়ে গেলে চলবে না। এদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে হবে। মানসিক শক্তি ফিরে পেয়েই দীনেশ মুখর হয়ে উঠলেন দারোগাবাবুকে নিয়ে।

—'খুব বীরত্ব দেখালেন বটে! আমাদের ডাকাত ভেবে এতগুলো সেপাই সমেত মিছেমিছি ব্যস্ত হলেন। আমরা যদি ডাকাতই হতাম, তাহলে তো সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র থাকত। আমাদের কারো হাতে তেমন কিছু দেখছেন কি?—তাহলে ডাকাত হলাম কি করে?'

এতক্ষণ পরে কাণ্ড-জ্ঞান ফিরে পেলেন দারোগাবাবু। 'সত্যিই তো! এরা কি করে ডাকাত হবে! না, বিরাট ভুল হয়ে গেছে!'

দারোগাবাবুর মনের কথা বুঝতে পেরে দীনেশ গুপ্ত ভাল মানুষের মত বলে উঠলেন—'অবশ্য ভুল কার না হয়! ওতো মানুষ মাত্রেই হয়। তাতে কি হয়েছে? বরং আমাদের মিষ্টিমুখ করিয়ে ভুলটা সংশোধন করে ফেলুন দাদা।'

দারোগাবাবুকে 'দাদা' বলে ডেকে তাকে একেবারে আপ্লুত করে ফেললেন দীনেশ গুপ্ত। বাধ্য হয়েই দারোগাবাবুকে মিষ্টি খাওয়াতেই হয়।—আর সে-কি খাওয়ার ধুম। দারোগাবাবুর চোখ ছানাবড়া। নিমেষের মধ্যে ময়রার দোকানের সব মিষ্টি শেষ। এরপরেও তাঁদের খাওয়া শেষ হয় না। দোকানের বাসী টক মিষ্টিগুলি, যেগুলিকে ফেলে দেবে বলে ময়রা আলাদা সরিয়ে রেখেছিল, সেগুলিও মুহূর্তের মধ্যেই উধাও।

—এই ছিলেন দীনেশ গুপ্ত। যে কোন পরিস্থিতিতেই তিনি সাবলীল। ভয় কি বস্তু জানেন না। হাসি কৌতূকে তার চিত্ত ভরপুর। গানে, আবৃত্তিতে তাঁর ছিল সিদ্ধকণ্ঠ।

কিন্তু কাজের সময়ে দীনেশ ভীষণ একনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ।

এমন সময় দলনেতার কাছ থেকে নির্দেশ এল দীনেশকে মেদিনীপুরে যেতে হবে। ওখানকার যুবশক্তিকে সংঘবদ্ধ করতে হবে। তার জন্য দীনেশই যোগ্য নায়ক।

ঢাকা ত্যাগ করে মেদিনীপুরে এসে কলেজে ভর্তি হ'লেন দীনেশ গুপ্ত এবং এর সঙ্গে তাঁর কাজ শুরু করে দিলেন। এখানকার যুবশক্তিকে সংগঠিত করে বৃহৎ আন্দোলনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পরাধীনতার বীজ উৎপাটন করতে হলে চাই অসংখ্য তরুণ যুবকের সম্মিলিত নিষ্ঠা ও শক্তি।—কাজের নেশায় মশগুল হয়ে পড়লেন দীনেশ গুপ্ত। মেদিনীপুরের যুবকেরা সবাই এগিয়ে এল। এমন দলনেতা পাওয়া ভাগ্যের দরকার।

১৯৩০ সাল। বাংলার দিকে দিকে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছে পূর্ণ উদ্যমে। যে করেই হোক দেশের স্বাধীনতা সূর্যকে অস্তমিত হতে দেওয়া চলবে না।—সর্বত্র এক রব—এগিয়ে চল। এতকাল আমরা পরাধীন থেকেছি, এবার প্রাণের বিনিময়ে দেশজননীর পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করতে হবে।—দীনেশ গুপ্তও অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলেন এই পরম সত্যকে।

১৯৩০ সালের ৭ই ডিসেম্বর। রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের আর মাত্র একটি দিন বাকী। কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে বসে আছেন দীনেশ গুপ্ত। তন্ময় হয়ে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি পড়ছেন নিজের মনে। এ যেন দুরন্ত দীনেশের শান্ত সমাহিত নতুন রূপ।

৮ই ডিসেম্বর। অগ্নিযুগের রক্তরাঙা ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। সকাল থেকেই প্রস্তুতি চলছে। দীনেশ তখন একাগ্রচিত্তে আবৃত্তি করে চলেছেন রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি। —রাইটার্স অভিযানে যাবার জন্য ট্যাক্সি এল। দীনেশ আবৃত্তি থামিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলেন আজকের অভিযানের অপর সঙ্গী বাদলকে নিয়ে। মুহূর্তে পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিলেন সায়োনাইড নামক

তীব্র বিষের শিশিটা ঠিক আছে কি-না! যদি অভিযান ব্যর্থ হয়, তাহলে ওদের হাতে জীবনটা না দিয়ে নিজেকে নিজেই শেষ করে দেবেন ;—এতে অনেক শান্তি।—ট্যাক্সি ছুটে চলেছে খিদিরপুরের পাইপ রোডের মোড়ের দিকে। সেখানে অপেক্ষা করবে অভিযানের অন্যতম নেতা বিনয় বসু।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে রাইটার্স বিল্ডিং-এ যথাসময়ে পৌঁছে সোজা ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসনের অফিস ঘরে গিয়েই তাঁদের হাতের রিভলভার গর্জে উঠল। সিম্পসনের মৃতদেহ তাঁর টেবিলে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল। তারপর, রাইটার্স বিল্ডিং-এর এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বীরত্রয়ের অভিযান শুরু হয়।

ইতিমধ্যে পুলিশবাহিনী চারদিকে ঘিরে ফেলেছে। দীনেশ গুপ্তের পিঠের বাঁ দিকে গুলী লেগে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। ঝর-ঝর করে রক্ত ঝরে পড়ছে।—আর উপায় নেই। রিভলভারের গুলীও প্রায় শেষ। এবার নিশ্চয়ই হিংস্র পুলিশ বাহিনী তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।—এর থেকে নিজ হাতে এ-জীবনকে শেষ করে দেওয়া অনেক গৌরবের। সায়োনাইড মুখে পুরে ফেললেন তিন জনেই। মুহূর্তে বাদল মৃত্যুর গভীরে তলিয়ে গেলেন। দীনেশ গুপ্ত ও বিনয়ের দেহে সায়োনাইডের প্রতিক্রিয়া ঘটার আগেই তাঁরা স্বহস্তে নিজেদের রিভলভারের শেষ গুলীটি চালিয়ে দিলেন মাথার ভিতর দিয়ে।—কিন্তু বীরের প্রাণ অত সহজে যাবার নয়।

দীনেশ গুপ্ত ও বিনয়কে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বিশেষ যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করা শুরু হল। পুলিশের অভিপ্রায় এঁদের বাঁচাতেই হবে। তাহলে সমস্ত রকম গোপন সংবাদ জানা যাবে। কদিন পর বিনয়ও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অদ্ভুত প্রাণশক্তির আধার দীনেশ ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠলেন। তাঁকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় রাখা হ'ল। চলল দীনেশের উপর নির্মম অত্যাচার। বিপ্লবীদের গুপ্ত আস্তানা

কোথায় ?—অসহ্য অত্যাচার করেও ইংরাজ শাসকবাহিনী তাঁর মুখ থেকে একটি স্বা-ও উচ্চারণ করাতে পারল না।

আলিপুরের সেশন জর্জ গার্লিক সাহেবের সভাপতিত্বে বিশেষ বিচার শুরু হ'ল। এ'তো বিচার নয়, বিচারের নামে প্রহসন।—বিচারে দীনেশকে ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল।

ফাঁসির খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠল সমগ্র বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ জুড়ে। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। —দীনেশের মৃত্যুদণ্ড কিছুতেই আমরা সহ্য করব না।

ওদিকে জেলের নির্জন কক্ষে দীনেশ নির্বিকার। তাঁর সময় কাটে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গীতা পাঠ করে। জেলে বসে বসে মা, বৌদি, ভাই-বোনকে চিঠি লেখেন দীনেশ। তাতে আসন্ন মৃত্যুর জন্য কোন ভয়, দুঃখ বিষাদের কথা নেই। যেন মৃত্যু তাঁর কাছে সহজ ও সুন্দররূপে আর্বিভূত।

১৯৩১ সালের ৬ই জুলাই। মধ্যরাত্রে সেপাইদের বুটের শব্দে দীনেশের ঘুম ভেঙে গেল। দীনেশের বুঝতে একটুও দেরী হ'ল না। কারা, কেন এগিয়ে আসছে তাঁর নির্জন কক্ষের দিকে।

দীনেশ গুপ্ত মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত। তাঁর মুখে তখন অমল প্রশান্তি।—কণ্ঠে সুর, 'রাঙিয়ে দিয়ে যাওগো এবার যাবার আগে'।—ধীর অথচ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে, নির্ভিক চিত্তে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন দীনেশ গুপ্ত। শেষবারের মত উচ্চারিত হ'ল তাঁর কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি।



শহীদ বাদল গুপ্ত

[রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের অন্যতম সহযোগী বয়সে তরুণ বাদল গুপ্ত অসীম সাহসের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ভাল নাম সুধীর গুপ্ত, তবে 'বাদল' নামেই তিনি অধিক পরিচিত। বাদলের পিতার নাম শ্রীঅবনীকান্ত গুপ্ত। ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিদগাঁও গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। ছাত্রাবস্থাতেই বাদল গুপ্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।]

বাংলার দিকে দিকে তখন বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ড চলছে। মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচন করা সেদিনকার প্রত্যেকটি তরুণ যুবকের স্বপ্ন। যে করেই হোক বিদেশী শাসক প্রভুদের হাত থেকে ভারতবাসীকে মুক্তি পেতেই হবে। এর জন্য যদি প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় তবুও রাজী।— একে একে অগুণিত তরুণ শক্তি এগিয়ে আসছে বুকে শপথের বাক্য নিয়ে। বিক্রমপুরের বানরী স্কুলের ছাত্র সুধীর গুপ্তও এগিয়ে এলেন। —ওই স্কুলের শিক্ষক, বিপ্লবী নেতা শ্রীনিকুঞ্জ সেন সুধীরের মধ্যে জ্বলন্ত আগুনকে চিনে নিতে ভুল করলেন না।—এই রকম জ্বলন্ত অগ্নির আজ প্রয়োজন, যার উত্তাপে বৃটিশ শক্তি দগ্ধ হয়ে যাবে। মাষ্টারমশাই নিকুঞ্জ সেন এগিয়ে এসে সুধীরকে শিষ্যত্বে বরণ করে নিলেন। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য।

ভা'ল নাম সুধীর গুপ্ত হলেও 'বাদল' নামেই তিনি ছিলেন সর্বত্র পরিচিত। ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিদগাঁও গ্রামে বাদলের জন্ম হয়।

তাঁর পিতার নাম শ্রীঅবনীকান্ত গুপ্ত। ছেলেবেলা থেকেই বাদল স্বল্পভাষী ও ঠাণ্ডা মাথার ছেলে। 'কথা-কম কাজ বেশী'—বাক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন এই বাদল গুপ্ত।

১৯৩০ সাল। সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। ইংরাজ সরকারের সঙ্গে কোন প্রকার সহযোগিতা নয়, তাদের উচ্ছেদ ঘটানোই অন্যতম উদ্দেশ্য। ঠিক হ'ল, সর্বত্র টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে সমসাময়িকভাবে অচল করে দিতে হবে। সে এক বিশাল কর্মকাণ্ড। বিক্রমপুরের দায়িত্ব দেওয়া হ'ল বাদলকে—বিপ্লবী দলের কয়েকজন সদস্য প্রথমটায় একটু সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন,—বয়সে একেবারে কাঁচা ওই ঠাণ্ডা, শান্ত ছেলেটা কি পারবে এত বড় দায়িত্ব পালন করতে! কিন্তু দলনেতা নিকুঞ্জ সেন তাঁর শিষ্যকে চেনেন। দেখা গেল, নির্দিষ্ট দিনে কি টেলিগ্রামের, কি টেলিফোনের তার কোন কিছুরই চিহ্নও নেই বিক্রমপুরে।

পুলিশ এই কাণ্ডের নেতাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। কিন্তু কোথায় বাদল?—ততক্ষণে তিনি বিক্রমপুর থেকে অনেক দূরে উধাও। সুতরাং পুলিশের সব চেষ্টাই ব্যর্থ।

১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর। ব্রিটিশ শক্তির মুলকেন্দ্র রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানে যে তিন জন তরুণ বিপ্লবী বীর অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে বাদল গুপ্তও একজন।

তখন তাঁর বয়স আর কত? সবে মাত্র আঠারোতে পা দিয়েছেন। তবুও এই দুঃসাহসিক অভিযানে অসীম সাহসী তরুণ বাদল যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা' ভুলবার নয়।

দলনেতা বিনয় বোসের নির্দেশ,—কাজ শেষ হলে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করতে হবে। কিছুতেই যেন জীবন থাকতে ব্রিটিশ পুলিশ তাদের ধরতে না পারে।—হাসতে হাসতে তাই করলেন বাদল। কারণ তিনি জানেন, যে কোন পরিস্থিতিতেই সৈনিকের কর্তব্য হ'ল সেনাপতির আদেশ

পালন করা। বাদল পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে শহীদ হ'লেন।

এরপর বাদলের মৃতদেহ পুলিশের হেপাজতে নিয়ে যাওয়া হয় আই. বি. অফিসে।—কে এই তরুণ, কি তার নাম—সবকিছুরই খোঁজ নিতে হবে পুলিশকে। মৃতদেহ সনাক্তকরণের সবরকমের ব্যবস্থা পুলিশ করলেন। দিনকয়েক পর বাদলের কাকা তরুণীকান্ত গুপ্ত মৃতদেহ দেখে সনাক্ত করলেন।

বাদলের মৃতদেহ সংকারের জন্য তাঁর আত্মীয়-স্বজন পুলিশ কমিশনারের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে রাত দশটার পর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া যায়।—গভীর রাতে নিমতলা শ্মশানঘাটে তাঁর মরদেহে অগ্নি প্রদান করা হয়!

ধন্য মায়ের ধন্য সন্তান বীরবিপ্লবী বাদল (সুধীর) গুপ্ত!



বারান্দা যুদ্ধের নায়ক বিনয় বোস

[—ঢাকার সন্নিকটে রাউথভাগ গ্রামের রেবতীমোহন বোসের পুত্র বিনয় বোস। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।—স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 'বারান্দা যুদ্ধ বা 'অলিন্দ যুদ্ধ' নামে যে সশস্ত্র অভিযান উজ্জ্বল অক্ষরে চিহ্নিত হয়ে আছে তার অন্যতম নেতা ছিলেন এই বিনয় বোস। ১৯৩০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর এই বিপ্লবী বীর মৃত্যুবরণ করেন।]

১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট। সকাল ন'টা নাগাদ ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের দিক থেকে ভেসে এল পরপর কয়েকটা রিভলভারের গুলির শব্দ।—সবাই ভীত ও সতর্কিত হয়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে আবার কোন্ অঘটন ঘটল।—চারদিকে প্রচণ্ড হৈ-হৈ পড়ে গেছে। হাসপাতাল চত্বরে যারা ছিল, তারা প্রত্যেকেই বিভ্রান্ত ও দিশেহারা।

ওদিকে তখন হাসপাতালের বারান্দায় রিভলভারের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া পুলিশ প্রধান মিঃ লোম্যান-এর নিস্পন্দ দেহটি পড়ে আছে। তার পাশে গুলিতে আহত পুলিশ সুপার মিঃ হড্‌সন ছটফট করছেন।—বাঁচবেন কি-না সন্দেহ। কারণ আঘাত অত্যন্ত গুরুতর।

জল পুলিশের বড়কর্তা মিঃ বার্ড অসুস্থ হয়ে মিটফোর্ড হাসপাতালে ক'দিন ধরে ভর্তি আছেন। তাকে দেখতে পুলিশ

প্রধান লোম্যান ও পুলিশ সুপার হড্সন হাসপাতালে এসেছিলেছন। লোম্যান নির্মম অত্যাচারী ও হড্সন দুষ্টু বুদ্ধির রাজা হিসেবে জনগণের কাছে পরিচিত।

কিন্তু এ'ত পুলিশ, এ'ত সেপাই শাস্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কোন্ দুঃসাহসী এমন কাজ করতে পারল?—এ যে বিশ্বাস করাও কষ্টকর।

গোয়েন্দা পুলিশের বড়কর্তা নিহত। এই ঘটনায় ইংরাজ সরকার যেন নতুন করে সচকিত হয়ে উঠলেন।—কে সেই আততায়ী!—এ নিশ্চই বিপ্লবীদের কাজ! পরদিন থেকে শুরু হ'ল ব্রিটিশ সিংহের তর্জন-গর্জন ও নানা অত্যাচার। মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্ররা কেউ এই অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতালের মধ্যে ঘটনাটা ঘটেছে, তখন কেউ না কেউ জানে কে এই হত্যাকারী! সুতরাং তাদের উপর চলল নির্মম অত্যাচার।

পুলিশের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মেডিক্যাল স্কুলেরই এক ছাত্র আততায়ীর নাম বলে দিয়েছে। সে নাকি তাঁকে গুলি ছুঁড়তে দেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে মেডিক্যাল স্কুলে টেনিসের ট্রফি বিজয়ীদের নিয়ে যে যে গ্রুপ ফটো ছিল, তা থেকে তাঁর ছবি আলাদা করে তুলে নেয় পুলিশ। ভারতবর্ষের প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে, থানায়-থানায় ও জনবহুল রাস্তায় আততায়ীর ছবি টাঙিয়ে দেওয়া হল।—ইংরাজ সরকার পুরস্কার ঘোষণা করলেন। যে এই শয়তানকে ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে। পরে এই টাকার অঙ্ক দশ হাজার টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়।

ইংরেজ সরকারের দৃষ্টিতে সেই শয়তান আততায়ী হাজার হাজার ভারতবাসীর চোখের মণি—স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি একজন ধ্রুবতারা।

তাঁর নাম বিনয় বোস। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের সেরা ছাত্র, রাজপুত্রের মত চেহারা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এই বিনয় বোস।

ঢাকার সন্নিকটে বিক্রমপুরের রাউথভাগ গ্রামের রেবতীমোহন বোসের পুত্র বিনয় বোস।

—শেষ পর্যন্ত পুলিশের অনুসন্ধান অভিযান ব্যর্থ হয়। বিনয় ধরা পড়েননি! অদ্ভুত কৌশলে বিনয় পালিয়ে গেলেন কলকাতায়।

সেদিন মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। তার সাথে দমকা হাওয়া। রাস্তা-ঘাট জনমানব শূন্য। তার মধ্য দিয়ে দু'জন গ্রাম্য মুসলমান হেঁটে চলেছেন। পরনে ছেঁড়া লুঙ্গি, গায়ে নোংরা গেঞ্জী, কাঁধে গামছা।—মুসলমান গ্রাম্য চাষার ছদ্মবেশে বিনয় বোস কলকাতার পথে চলেছেন। কোনভাবে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছাতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তারপর ষ্টীমারে চেপে এগিয়ে যাবেন। কিন্তু সে পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হল না। ষ্টীমার, রেলগাড়ী, লঞ্চ, নৌকা সব সার্চ করা শুরু হয়েছে। সন্দেহ হ'লেই পুলিশ গ্রেপ্তার করছে—যাতে আততায়ী এই অঞ্চল ছেড়ে পালিয়ে যেতে না পারে।—তাই অনেক সাবধান কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো কিছুটা রেলগাড়িতে চেপে বন্দরভৈরব, কিশোরগঞ্জ, জগন্নাথ ঘাট হয়ে বিনয়কে কলকাতায় পৌঁছাতে হয়।—কলকাতায় পৌঁছেই সোজা ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীটের মুসলমান পল্লীর একটি বাড়ীতে তিনি আশ্রয় নেন। আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করা ছিল।

কন্তু ওয়েলেস্‌লীতে বেশীদিন থাকাও নিরাপদ নয়। গোয়েন্দা পুলিশের অধিকর্তা কুখ্যাত চার্লস টেগার্টের চোখে ফাঁকি দিয়ে এক জায়গায় বেশীদিন থাকা নিরাপদ নয়। নেকড়ের মত তীক্ষ্ণ টেগার্টের দৃষ্টি। সর্বত্র বিনয় বোসের ছবি টাঙানো আছে। তাই আত্মগোপনের জন্য বিনয়ের প্রয়োজন নিরাপদ ও নিরিবিলি স্থান।—বিনয় বোসকে নিয়ে আসা হ'ল বেলেঘাটায়, বিপ্লবীদের আরেকটি গোপন আস্তানায়। কিন্তু এখানেও টেগার্টের দৃষ্টি এড়িয়ে বেশীদিন থাকতে পারলেন না বিনয় বোস।

—একদিন গভীর রাতের ঘটনা। চারিদিক নিস্তব্ধ। অন্যান্য

রাতের মত সে রাতেও বিনয় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎই তাঁর ঘুম ভেঙে যায় এবং কেন যেন মনে হয় এখানে এক ভয়ংকর বিপদ আসন্ন। মনে হওয়া মাত্র সে অন্য জায়গায় সরে পড়ে।—আশ্চর্য! বিনয় বোসের আশঙ্কা মিথ্যা ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ বাহিনী ঘিরে ফেলল সেই বাড়ীটা।—টেগার্টের চোখে আনন্দের ঝিলিক। এবার তো ধরা পড়তেই হবে। পালানোর কোন রাস্তা নেই। ধূর্ত টেগার্ট রিভলভার হাতে বীরদর্পে প্রবেশ করলেন ঘরের মধ্যে। কিন্তু ঘর যে শূন্য! কেউ কোথাও নেই। টেগার্ট বিস্ময়ে হতবাক্।

শুরু হ'ল বিপ্লবীদের মধ্যে মন্ত্রণা সভা। কি করা যায় বিনয়কে নিয়ে?—ওকে যে করেই হোক্ ইংরাজ বাহিনীর নিষ্ঠুর হাত থেকে রক্ষা করতেই হবে। এরকম সোনার ছেলে, মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনে যাঁর ভূমিকা অপরিহার্য,—তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ভীষণ প্রয়োজন।

অনেক ভেবে চিন্তে সুভাসচন্দ্র তাঁর অভিমত জানালেন, অবিলম্বে বিনয়কে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হোক্। এখানে থাকলে একদিন না একদিন পুলিশের হাতে ধরা পড়তেই হবে। একইরকম অভিমত ব্যক্ত করলেন শরৎচন্দ্র বোস।—কিন্তু বিদেশে বিনয়কে পাঠাতে গেলে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সুভাষচন্দ্র নিজে অর্থ ও বিদেশে বিনয়ের থাকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাছাড়া অর্থ দিতে এগিয়ে এলেন আচার্য পি. সি. রায় এবং লেডি অবলা বোস।—বিনয় যে সবারই বড় গর্বের ধন।

গোপনে বিনয়কে বিদেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা প্রায় পাকা।—কিন্তু যাঁকে নিয়ে এত কর্মকাণ্ড সে-ই বেঁকে বসলেন। দেশ ছেড়ে বিদেশে পালিয়ে থেকে দিনযাপনের গ্লানি বিনয় বোস সহ্য করতে পারবেন না। ভা'ল লাগে না তাঁর কাপুরুষের মত পলাতক জীবন। এর চাইতে আরো বৃহৎ কোন আঘাত হেনে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ-

শক্তির উৎখাত ত্বরান্বিত করে দেশের বুকেই বিনয় লুটিয়ে পড়তে চান।

বেলেঘাটার ঘটনার পর দলের একনিষ্ঠ কর্মী মেটিয়াবুরুজের রাজেন গুহর বাড়ীতে বিনয় বোসকে রাখা হ'ল। কিন্তু এভাবে আত্মগোপন করে দিনের পর দিন চুপ করে বসে থাকার ছেলে বিনয় নন। তাই—'বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স' দলের নতুন দুঃসাহসিক পরিকল্পনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন।

এই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা যেমন অকল্পনীয় তেমনি দুঃসাহসিক। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির সব থেকে শক্ত ঘাঁটি রাইটার্স বিল্ডিং। সেখানে এবার চরম আঘাতে হানতে হবে! বিপ্লবীদের প্রথম লক্ষ্য কারাবিভাগের অধিকর্তা কর্নেল সিম্পসন। এই সিম্পসনের ইঙ্গিতে আলিপুর জেলে শ্রদ্ধেয় সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছিল। সুতরাং তাকে এর ফলভোগ করতেই হবে। এই কঠিন অভিযানের জন্য আরো দুজন তরুণ বিপ্লবী এগিয়ে এলেন। তাঁরা হলেন দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্ত।

১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর। রাজেন গুহর বাড়ী থেকে মূল্যবান স্যুটে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে এলেন বিনয় বোস। দীনেশ ও বাদলেরও একই রকম পোশাক। তাঁরা এসে মিলিত হলেন খিদিরপুরের পাইপরোডের মোড়ে—তাঁদের দেখে মনে হচ্ছে সদ্য কোন সিভিল সার্ভিস পাশ করা অফিসার।

বেলা প্রায় বারোটা। ট্যাক্সি থেকে বীরত্রয় নেমে সোজা এগিয়ে গেলেন রাইটার্স বিল্ডিং-এর প্রধান ফটকের দিকে। প্রহরীরা কেউ বাধা দিল না। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে থমকে দাঁড়ান বিনয়। বীরত্রয় পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে নিলেন মুহূর্তের জন্য। চাপা গলায় বিনয় সঙ্গী দুজনকে বললেন, 'মনে রেখো, প্রতিটি গুলির সদ্ব্যবহার করতে হবে। শুধু শেষটি নিজের জন্য রাখবে। তাছাড়া পকেটে তো সায়োনাইড আছেই।

দ্রুত পায়ে তাঁরা কর্নেল সিম্পসনের ঘরে প্রবেশ করেন। মুহূর্তে আগুন ঝলসে ওঠে বিনয়, বাদল ও দীনেশের পিস্তলের নলে। পরপর ছটা গুলি। রক্তাপ্লুত সিম্পসন্ ঘটনাটা ভাল করে বোঝার আগেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন।

তারপর রাইটার্স বিল্ডিং-এর দোতলায় এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বীরত্রয়ের হানা শুরু হল। অকল্পনীয় এই দুঃসাহসিক অভিযানে ব্রিটিশ সরকারের শাসন কেন্দ্র কেঁপে উঠল। গুলির শব্দ শুনে রিভলবার হাতে ছুটে এলেন পুলিশের বড়কর্তা মিঃ ক্রেগ। বিনয়, বাদল, দীনেশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। ওদেরও রিভলবার গর্জে উঠল। কোন কথা নয়। একেবারে গুলির জবাবে গুলি। মিঃ ক্রেগ আক্রান্ত দেখে এগিয়ে এলেন সহকারী আই. জি. মিঃ জোনসর কিন্তু ওঁরা তিনজনে তখন মরীয়া। তাঁদের ঠেকানো অসম্ভব।

রাইটার্স থেকে এর মধ্যে এক ফাঁকে লালবাজারে টেগার্ট-এর কাছে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল শেতাঙ্গরা বিপ্লবীদের হাতে আক্রান্ত। সিম্পসন সাহেবকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। খবরটা শুনে টেগার্ট স্তম্ভিত। এও কি সম্ভব? খোদ্ রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান!—বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে হিংস্র জন্তুর গর্জন করতে করতে ছুটে গেলেন রাইটার্স বিল্ডিং-এর দিকে! তাঁকে অনুসরণ করে ছুটলেন ডেপুটি কমিশনার গর্ডন ও বার্ট।

একদিকে সশস্ত্র বাহিনী সহ ইংরাজ সেনাদল, অন্যদিকে মাত্র তিনজন বিপ্লবী বীর। বিনয়, বাদল, দীনেশ। কিন্তু এই তিন জনই সেদিন যে বীরত্বের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন তা কল্পনাতীত। তৎকালীন স্টেট্‌সম্যান পত্রিকা এই সশস্ত্র সংগ্রামকে 'বারান্দা যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছিলেন।

এদিকে বিনয়, বাদল, দীনেশ তিনজনারই রিভলবারের গুলি শেষ হয়ে এসেছে।—এখন উপায়! তাহলে কি ঐ ঘৃণ্য শাসক গোষ্ঠীর হাতে প্রাণ দিতে হবে?—না, যতক্ষণ শ্বাস আছে তা হতে

দেব না আমরা। নেতা বিনয় বোসের আদেশে বাদল সায়োনাইড মুখে ঢেলে দেন। আর বিনয় ও দীনেশ নিজেদের মাথা লক্ষ্য করে রিভলভারের শেষ গুলিটি নিক্ষেপ করেন।—তিনজনারই দেহ মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে।

টেগার্ট সহ পুলিশের অন্যান্য কর্তারা ততক্ষণে বীরদর্পে মৃতপ্রায় দেহ তিনটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছে।—বাদলের প্রাণ নিঃশেষ হয়ে গেছে। বিনয় ও দীনেশের প্রাণস্পন্দন তখনো থামে নি।—কাপুরুষ টেগার্ট ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ঐ অবস্থাতেই বিনয়ের আঙ্গুলগুলো বুট দিয়ে মাড়িয়ে ভেঙে দিলেন।—কিন্তু না। মনে মনে ভাবলেন টেগার্ট এই বিপ্লবী শয়তানগুলিকে এখনই মেরে ফেললে চলবে না। কারণ এদের কাছ থেকেই বিপ্লবীদের গুপ্ত আস্তানা ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রের কথা জানতে হবে। তারপর ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে শাস্তি দিতে হবে।

বিনয় ও দীনেশকে পুলিশ পাহারায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেখে সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন ইংরাজ সরকার!—বিনয় ও দীনেশ দুজনেই ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। মনে হয় সু-চিকিৎসার গুণে দুজনেই এ যাত্রা বেঁচে যাবেন।

কিন্তু বিনয়কে ধরে রাখা গেল না। ব্রিটিশ শাসকের দেওয়া দণ্ড তিনি কিছুতেই গ্রহণ করবেন না। একদিন বিনয় ইচ্ছে করেই তার মাথার ক্ষতস্থানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন দাঁতে দাঁত চেপে! অসহ্য যন্ত্রণা! হোক, এই ভাল। ইংরাজ তাঁর জাতির শত্রু। তাদের সেবা-শুশ্রূষায় সে প্রাণ ধারণ করবে—এ' হতেই পারে না। —দু একদিনের মধ্যেই ক্ষতস্থান বিষিয়ে উঠল। সুতরাং আর আশা নেই। ধীরে ধীরে বিনয় মৃত্যুর গভীর অন্ধকার গহ্বরের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

বহুকষ্টে পুলিশের অনুমতি আদায় করে হাসপাতালে দেখা করতে এলেন বিনয়ের মা, বাবা ও বড়ভাই বিজয় বসু।—বিনয়ের

তখন প্রায় শেষ অবস্থা। বিকার শুরু হয়েছে। বিকারের ঘোরে বিনয় ক্রমাগত বলে চলেছেন 'এ্যাটেনশান প্লীজ। ফরোয়ার্ড মার্চ! লেফ্‌ট-রাইট, লেফ্‌ট-রাইট'। তারপর ধীরে ধীরে বিকারের কথা অস্পষ্ট হ'তে হ'তে এক সময় একেবারেই স্তব্ধ হয়ে যায়।—বিনয়ের মা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। বিনয়কে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন—'আমি এসেছি বিনু, একবার চোখ মেলে দেখ বাবা'।—কয়েক মুহূর্তের জন্য বিনয়ের স্থির দেহটা নড়ে ওঠে।—হয়তো বা মায়ের ডাকে মুহূর্তের জন্য মৃত্যুর ঘুম থেকে জেগে উঠলেন বিনয়। গর্ভধারিণী জননীর মধ্যেই তো দেশ-জননীর ছবি লুকিয়ে থাকে।—বিনয়ের হাতটা একটু একটু করে কপালের কাছে উঠে যায় স্যালুটের ভঙ্গীতে।

তারপর সব শেষ।

—সেদিন তারিখ ছিল ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩০ সাল।



মাষ্টারদা সূর্য সেন

[চট্টগ্রামের বিখ্যাত নেতা সূর্য সেন সকলের কাছে 'মাষ্টারদা' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি কর্মজীবনে চট্টগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ের অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন।—বিপ্লবী সূর্য সেন ছাত্র ও তরুণদেরকে নিয়ে চট্টগ্রামে একটি শক্তিশালী বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তোলেন। সূর্য সেনের নেতৃত্বে এই বিপ্লবী বাহিনী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে ইংরাজ শাসকের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন।—১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী আজন্ম সংগ্রামী মাষ্টারদা ফাঁসীর মঞ্চে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।]

চট্টগ্রাম শহর। আদুরে নাম চট্টলা। শহর থেকে একটু দূরে পাহাড়। সামনে বিস্তৃত মাঠ। পাহাড়েব গায়ে ছোট-ছোট কয়েকটি কুঁড়েঘর। ধানের ক্ষেত পাহারা দেবার জন্য এই ঘরগুলি বিচ্ছিন্নভাবে চাষীরা তুলেছিল। মাঠে এখন ফসল নেই। তাই কুঁড়েঘরগুলিতে বর্তমানে কেউ থাকে না। এর মধ্যে একটি কুটিরের ভিতর এক ভীষণদর্শনা কালীমূর্তি। মূর্তির সম্মুখে এক মধ্যবয়সী কৃষ্ণকায় পুরুষ বসে আছেন। স্থির শান্ত অপলক দৃষ্টিতে কালীমূর্তির দিকে তাকিয়ে আছেন। নিস্তব্ধ রাত্রি। চরাচর জুড়ে গভীর অন্ধকার। মন্ত্রমুগ্ধের মতো এক-এক করে তরুণ, যুবক, যুবতী সংগোপনে আসছেন রক্ত দিয়ে মাতৃমূর্তির সামনে শপথ নিতে। প্রাণের বিনিময়ে হলেও জন্মভূমিকে বিদেশী শাসকের হাত থেকে স্বাধীন করতে হবে। —শপথ শেষে সকলে সেই সমাহিত মানুষটির শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করে বিপ্লবীর বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হতে চান।

কিন্তু কে এই মানুষটি? যাঁর কাছে স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত হতে সকলে উন্মুখ!

ইনিই চট্টগ্রামের বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন, যিনি সকলের কাছে 'মাষ্টারদা' নামে পরিচিত।

স্বল্পভাষী ও মিষ্ট স্বভাবের মানুষ সূর্য সেন ছিলেন চট্টগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ের অঙ্কের শিক্ষক। তাই সকলের কাছে তিনি মাষ্টারদা।

এই স্বল্পভাষী অমায়িক স্বভাবের মানুষ সূর্য সেনের বুকে বিদ্রোহীর দীপ্ত তেজ। বিদেশী শাসকের হাত থেকে মাতৃভূমির মুক্তির স্বপ্ন তাঁর চোখে। মাষ্টারদার ব্যক্তিত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্রের দল তাঁর চারপাশে ভিড় করতে লাগলো। এঁদের চোখেও স্বাধীনতার স্বপ্ন। তাঁরা পথ-প্রদর্শক হিসেবে মাষ্টারদাকে কাছে পেতে চান।

সূর্য সেন এই ছাত্র ও তরুণদলকে নিয়ে চট্টগ্রামে একটি বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তোলেন নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্যে, কিন্তু শুরুতেই অর্থকষ্টের মধ্যে পড়তে হ'ল। সংগঠনের জন্যে এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু এত অর্থ আসবে কোথা থেকে? বিপ্লবী-সদস্যরা অর্থ-সংগ্রহ করার জন্যে ডাকাতি করতে চান। মাষ্টারদা গভীর চিন্তায় মগ্ন। ডাকাতি করা কি ঠিক্ হবে? কিন্তু তাছাড়া যে কোনো উপায় নেই। অর্থের বড় প্রয়োজন। অবশেষে দলপতি মাষ্টারদা নির্দেশ দিলেন, "ডাকাতি করে অর্থ-সংগ্রহ করো। তবে দেশের লোকের নয়, সরকার কিংবা বিদেশী বণিকের তহবিল লুট করো।"

১৯২৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। চট্টগ্রাম শহর থেকে পিচঢালা রাস্তা পাহাড়তলির দিকে সোজা চলে গিয়েছে। রাস্তার ধারে, গাছের আড়ালে চারজন যুবক লুকিয়ে আছেন। তাঁদের বহু প্রত্যাশিত ঘোড়ার গাড়ীর চাকার ঘড়-ঘড় শব্দ দূর থেকে ভেসে আসছে! গাড়ীটা কাছে আসতেই দুজন যুবক রিভলবার হাতে করে গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে যান এবং কোচম্যানকে ঠেলে নীচে

ফেলে দিয়ে তাঁরা গাড়ী জোরে হাঁকিয়ে দেন।—রেল কোম্পানীর মাস মাইনের সতের হাজার টাকা ঐ গাড়ী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে যুবক দু'জন টাকা নিয়ে হাজির হলেন দূর গাঁয়ের এক মেটে-ঘরের সামনে, তাদের নেতার কাছে। মাষ্টারদার ছকে দেওয়া কৌশল ব্যর্থ হয় নি!—এই ঘটনা "পাহাড়তলী-ডাকাতি" নামে পরিচিত।

শাসক মহলে মাষ্টারদা সূর্য সেন ভয়ঙ্কর এক নাম। অদ্ভুত কৌশলে সমস্ত রকম পরিকল্পনা গোপনে ছকে নিয়ে লোকটা একের পর এক ঘটনা সংঘটন করে চলেছেন শাসকদের বিরুদ্ধে। অথচ পুলিশবাহিনী তাঁকে ধরতে পারছে না। কতবার তিনি ধরা পড়তে পড়তে অদ্ভুত কৌশলে পালিয়ে গেছেন। লোকে বলে, মাষ্টারদা যাদু জানে। তাকে ধরা পুলিশের সাধ্য নেই।

কিন্তু ১৯২৫ সালে ক'লকাতায় মাষ্টারদা সত্যিই ধরা পড়লেন। ছাড়া পেলেন ১৯২৮ সালে। এর পর সূর্য সেন গান্ধীজির অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। তবে কিছু দিনের মধ্যে বিভিন্ন কারণে গান্ধীজির পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি তাঁর বিশ্বাসে ফাটল ধরল। তিনি আবার ফিরে এলেন চট্টগ্রামে। নতুন উদ্যম নিয়ে কিশোর ও যুবকদের সহায়তায় মাষ্টারদা গড়ে তুললেন "ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি" দল। চট্টগ্রাম থেকে বিদেশী প্রভুদের উৎখাত করতেই হবে। সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে চট্টগ্রামের দখল নিতে চান মাষ্টারদা। কিন্তু অস্ত্র-সংগ্রহের উপায় কি? মাষ্টারদার চোখে ভেসে ওঠে চট্টগ্রামে অবস্থিত সরকারী অস্ত্রাগারের ছবি। সুতরাং আর বিলম্ব নয়। ওখান থেকেই সংগ্রহ করতে হবে যাবতীয় অস্ত্র। মাষ্টারদা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরিকল্পনা স্থির করে ফেললেন। স্থির হ'ল বিপ্লবীরা তিনটি দলে ভাগ হয়ে একই সময়ে আক্রমণ শুরু করবে 'পুলিশ অস্ত্রাগার', 'রেলওয়ে অস্ত্রাগার' এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিসে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের

জন্য ছয়জন বীর বিপ্লবীর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করলেন মাষ্টারদা। এঁরা হলেন—অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী ও উপেন ভট্টাচার্য।

১৯৩০ সালের ১৮'ই এপ্রিল। একে একে প্রত্যেক বিপ্লবীদের যথাযথ নির্দেশ দিলেন মাষ্টারদা। রাত দশটায় অস্ত্রাগার অক্রমণের সময় নির্ধারিত হয়েছে। মাষ্টারদা আরও নির্দেশ দিলেন,—'যার যেটা কাজ, সেটা সমাধা করে এসে সমবেত হবে পুলিশ অস্ত্রাগারের সামনে। ওখানে আমি থাকব।'

রাত নয়টা পঞ্চাশ মিনিট। ইউরোপীয় সামরিক পোশাকে নিজেদের সজ্জিত করে গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ উপস্থিত হলেন পুলিশ অস্ত্রাগারের সামনে। সময় হয়ে এসেছে। আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা যাবে না। অতর্কিতে তাঁরা দুজনে আক্রমণ চালালেন প্রহাররত প্রহরীদের ওপর। হঠাৎ আক্রমণের ফলে, প্রহরীরা বাধা দেবার সময় পেল না। অনেক প্রহরীই ধরাশায়ী হল এবং কিছু প্রহরী সুযোগ বুঝে প্রাণভয়ে এদিকে-ওদিকে ছুটে পালালো। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী মাষ্টারদা ও ত্রিশজন বিপ্লবী যুবক পুলিশ অস্ত্রাগারের আশে-পাশে লুকিয়ে ছিলেন। তাঁরাও এবার ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। একই সময়ে লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের নেতৃত্বে রেলওয়ে অস্ত্রাগারে আক্রমণ শুরু হ'ল। অন্যদিকে সমস্ত রকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে আক্রমণ হানা হলো টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিসে।

বিপ্লবীরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গুলী দখল করলেন। তারপর দুটি অস্ত্রাগারেই আগুন ধরিয়ে দিলেন। দুঃসাহসে বলীয়ান, দেশমুক্তির নেশায় মত্ত, বিপ্লবের আদর্শে দীক্ষিত মাষ্টারদার নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা ইংরেজের "ইউনিয়ান জ্যাক্" নামিয়ে ফেলে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিলেন। বিপ্লবীরা তাঁদের দলপতি মাষ্টারদাকে সামরিক রীতিতে 'গার্ড-অব-অনার' জানিয়ে সম্মানিত করলেন। চতুর্দিকে 'বন্দে মাতরম্'

ধ্বনি ঘন ঘন উচ্চারিত হতে লাগল। চট্টগ্রামের বুকে মৃত্যুবিজয়ী বীরদের জয়নাদে চারদিক মুখরিত হলো।

এবার মাষ্টারদা নির্দেশ দিলেন, আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়, পালাতে হবে এখান থেকে। ওদিকে জাহাজ ঘাটের জেটি থেকে ততক্ষণে শুরু হয়েছে 'লুইস গান' দিয়ে প্রবল গুলিবর্ষণ। এ পথে অগ্রসর হওয়া যাবে না। এদিকে মাষ্টারদার নির্দেশে অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ আহত বিপ্লবীদের নিরাপদ স্থানে রেখে আসতে গেছেন, তাঁরাও ফিরছেন না। মাষ্টারদা স্থির করলেন, অবিলম্বে শহরে না গিয়ে কয়েকদিনের জন্য পাহাড়ে আত্মগোপন করতে হবে।

তিন দিন প্রায় অতিক্রান্ত। একটানা পাহাড়ের পথে হেঁটে সবাই ক্লান্ত, ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় সকলে অবসন্ন। বিপ্লবীরা আত্মগোপন করেছেন জালালাবাদ পাহাড়ে। সমগ্র দেশ জুড়ে হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেছে। ইংরেজ পুলিশবাহিনী ঘোষণা করেছে বিপ্লবীদের যে ধরিয়ে দিতে পারবে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে।

২২শে এপ্রিল। মাষ্টারদার দৃষ্টি হঠাৎ-ই পাহাড়ের নীচে পড়েছে। তিনি দেখতে পেলেন দুদিক থেকে বিরাট পুলিশবাহিনী তাঁদের অভিমুখে চুপি চুপি এগিয়ে আসছে। এবার আর বুঝি রক্ষে নেই! কিন্তু এত সহজে হার স্বীকার করার পাত্র সূর্য সেন নন। বিপ্লবীদের নির্দেশ দিলেন, পুলিশবাহিনী আক্রমণ শুরু করার আগেই অতর্কিত আক্রমণ হানো। শুরু হয়ে গেল অসীম যুদ্ধ। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিপ্লবী তরুণ আর বিরাট পুলিশবাহিনী।

পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত, অভুক্ত বিপ্লবীরা সেদিন যে বীরত্ব দেখিয়েছেন, তা বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে—এই যুদ্ধে এগারো জন বিপ্লবী নিহত ও আরও কয়েকজন গুরুতর আহত হন এবং বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয় প্রায় একশত পঞ্চাশ জন ইংরেজ পুলিশ।

এদিকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ দলনেতা সূর্য সেনকে ধরতে না পেরে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কৌশলে জালালাবাদ পাহাড় থেকে মাষ্টারদা

পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকেন এবং নতুন করে বিপ্লবী বাহিনী তৈরি করতে সচেষ্ট হন। তিনি নারী-বাহিনী গড়ে তোলেন। এই নারী-বাহিনীর প্রধানা দুই বিপ্লবী শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দার ও কল্পনা দত্ত মাষ্টারদার মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। এমন সময় পুলিশের চর অর্থলোভী নেত্র সেন পুরস্কারের লোভে ষড়যন্ত্র করে মাষ্টারদাকে ধরিয়ে দেন। দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের, দুর্ভাগ্য বিদ্রোহীদের। সেদিন তারিখ ছিল ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ সাল।

সূর্য সেনকে নিয়ে শুরু হ'ল বিচারের নামে প্রহসনের পালা। ১৯৩৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী মাষ্টারদা ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী। রাত তখন বারোটা। ফাঁসি মঞ্চের দিকে এগিয়ে চললেন আজন্ম বিপ্লবী বীর সূর্য সেন, সকলের প্রিয় মাষ্টারদা! উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন 'বন্দে মাতরম্'। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে সে ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।— তারপর সব শেষ। মহাপ্রাণের অবসান ঘটল। রাত্রির অন্ধকার আবার নিঃশব্দের আশ্রয়ে ঢলে পড়ে যথারীতি।

বারীন ঘোষ

[ঋষি অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী লণ্ডনের উপকণ্ঠে জন্মগ্রহণ করেন। বারীন্দ্রের পিতার নাম ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ ও মাতার নাম স্বর্ণলতা দেবী।—দেওঘর বিদ্যালয়, পাটনা কলেজ ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজে বারীন্দ্রকুমার শিক্ষালাভ করেন। দেওঘর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ বসু ও সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁর মনে দেশাত্মবোধের সঞ্চার করেন।—অরবিন্দ ঘোষের পরিকল্পনায় মাণিকতলায় মুরারীপুকুর বাগানের গুপ্ত সমিতি গঠিত হলেও বারীন্দ্র ঘোষই ছিলেন এই সমিতির প্রকৃত নেতা। দেশবাসীকে স্বদেশ-চেতনায় অনুপ্রাণিত করে তোলার জন্য ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বারীন্দ্রকুমার 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করেন।—১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বারীন্দ্রকুমার বিপ্লবী সহচরগণসহ মাণিকতলার মুরারীপুকুর বাগানে গ্রেফতার হন। ব্রিটিশ সরকারের শাস্তিস্বরূপ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন।—এই মহান বিপ্লবী ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল করোনারী থ্রম্বোসিস রোগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।]

রাতের অন্ধকারে ব্রিটিশ সরকারের সশস্ত্র পুলিশবাহিনী ঘেরাও করে ফেলে মুরারীপুকুর বাগান। পুলিশ অনুসন্ধান করে জেনেছে, এখানে একদল বিপ্লবী আত্মগোপন করে আছেন, যাঁরা কি-না ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। শুধু তাই নয়। এখানে না-কি বোমাও তৈরি হয়ে থাকে!—ভারী বুটের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় বিপ্লবী নেতার। উঁকি মেরে দেখেন, চারদিকেই সশস্ত্র পুলিশ ঘিরে রেখেছে। ধরা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন বিপ্লবী নেতা।—রিভলবার উঁচিয়ে ধরে পুলিশ সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করে 'কে তুমি ?'—পরিচয় পাওয়া মাত্র পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে তাঁকে। সেখানে

উপস্থিত অন্যান্য বিপ্লবীরাও একে একে পুলিশবাহিনীর হাতে ধরা পড়লেন।—তারপর শুরু হ'ল তাঁদের ওপর ব্রিটিশ পুলিশের বর্বরোচিত অত্যাচার।—"কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বোমা ও অন্যান্য মারণাস্ত্র!" —বিপ্লবীদের কাছ থেকে এ' প্রশ্নের সঠিক উত্তর না পেয়ে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল পুলিশবাহিনী। বিপ্লবী দলনেতা নিজের ওপর নির্মম অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে থাকেন। কিন্তু দু'জন অল্প বয়সী বিপ্লবীর ওপর নির্যাতন তিনি আর সহ্য করতে না পেরে বলে দেন অস্ত্র-শস্ত্রের সন্ধান।

বাইরে কঠিন অথচ অন্তরে কোমল এই দলনেতার নাম শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ।—অরবিন্দ ঘোষের উৎসাহ ও পরিকল্পনায় গঠিত হয়েছিল মাণিকতলায় মুরারীপুকুর বাগানের গুপ্ত সমিতি। কিন্তু এই সমিতির প্রকৃত নেতা ছিলেন অরবিন্দের ছোট ভাই বারীন্দ্র কুমার ঘোষ।

পিতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ সপরিবারে যখন বিলেত যাচ্ছিলেন, তখন সমুদ্রের ওপর বারীন্দ্র কুমারের জন্ম হয়। বিশাল বারিধিবক্ষে জন্ম হয়েছে বলে নবজাতকের নাম বারীন্দ্র রাখা হয়।

বারীন্দ্রের যখন বারো বছর বয়স তখন তিনি তাঁর দাদামশাই ঋষি রাজনারায়ণ বসুর কাছে দেওঘরে চলে আসেন। রাজনারায়ণ বসুর চারিত্রিক দৃঢ়তা বালক বারীন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর প্রভাবে কিশোর কাল থেকেই বারীন্দ্রের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি ও ধর্মভাব জাগ্রত হয়।—দাদামশাই রাজনারায়ণ বসুর প্রেরণায় কিশোর বয়স থেকেই বারীন্দ্র শরীর ও চরিত্রকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার অভ্যাস আয়ত্ত করেন। বালক-কাল থেকেই বারীন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যোগ-সাধনার দ্বারা দৈবশক্তির অধিকারী হওয়া যায়। তাই একদিন বন্ধু উপেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করে তিনি বেরিয়ে পড়েন উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে। এখানে-সেখানে ঘুরতে ঘুরতে বারীন্দ্র কুমার দু'জন সাধু পুরুষের সান্নিধ্যে আসেন। এঁদের মধ্যে একজন হ'লেন 'সাখরিয়াবাবা' এবং

অন্যজন হলেন 'বিষ্ণুভাস্কর লেলে'।—এই বিষ্ণুভাস্কর লেলের কাছ থেকে বারীন্দ্র দীক্ষা গ্রহণ করেন। বস্তুতপক্ষে এই দীক্ষাই তাঁর জীবনে এনে দিয়েছিল সীমাহীন মানসিক শক্তি, যার সাহায্যে তিনি ব্রিটিশের নির্মম উৎপীড়নকে তুচ্ছজ্ঞান করতেন।

দীক্ষা গ্রহণের শেষে সাধু-সঙ্গ ত্যাগ করে বারীন্দ্র কুমার ফিরে আসেন ক'লকাতায়। এবার তিনি পূর্ণ উদ্যমে স্বদেশমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে ব্রতী হ'লেন। মুরারীপুকুর গুপ্ত সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

সুরাটে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গুপ্ত সমিতির কয়েকজন বিপ্লবীসহ যোগদান করেন বারীন্দ্র কুমার। তাঁর অভিপ্রায় ছিল, এখানে সকলের সাথে যোগাযোগ করে সারা ভারতব্যাপী একটা বিপ্লবী দল গঠন করবেন। কিন্তু বারীন্দ্রের অভিপ্রায় ফলপ্রসূ হ'ল না। কারণ অন্য প্রদেশের বিপ্লবীরা বাংলাদেশের বিপ্লবীদের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে চাইলেন না।—এতে দুঃখ পেলেও হতাশ হলেন না বারীন্দ্র কুমার। বাংলা একাই পথ চলবে এই দুঃসময়ে।

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠিত করতে গেলে প্রয়োজন প্রভূত অর্থের। কিন্তু এ টাকা আসবে কোথা থেকে? ধনী ব্যক্তিদের নিকট আবেদন করলে কৃত্রিম সহানুভূতি পাওয়া যায় বটে, অর্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং বারীন্দ্রের নেতৃত্বে বিপ্লবী দল ডাকাতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হ'লেন।

দেশের সাধারণ মানুষেরা স্বদেশীদের খুব একটা শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। ইংরাজ সরকারের মিথ্যা প্রচারে সাধারণ দেশবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, বিপ্লবী মানেই ডাকাত।—এই ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেবার জন্য ও দেশবাসীকে, বিশেষ করে দেশের যুবশক্তিকে, সচেতন করে তোলার জন্য বারীন্দ্র কুমার ঘোষ 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

এই সময় ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের আদালতে স্বদেশীদের বিচার হ'ত। প্রায় সব কটি বিচারেরই তিনি অন্যায়ভাবে সাজা দিতেন বিপ্লবীদের। তাই বিপ্লবীরা কিংসফোর্ডকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বারীন্দ্রের দল উদ্ভাবন করলেন নতুন এক কৌশল। একখানা মোটা বইয়ের মলাটের মধ্যে একটি ছোট অথচ শক্তিশালী বোমা এমনভাবে রাখা হ'ল, যাতে মলাট খোলা মাত্রই বোমাটি ফেটে যাবে। বইখানা সাহেবকে উপহার দেওয়া হ'ল। সাহেবের ভাগ্য ভাল। বইটি না খুলে তিনি আলমারীতে তুলে রাখেন। পরে একদিন কিংসফোর্ডের বেয়ারা আলমারীর বই পরিষ্কার করতে গেলে বোমাটি ফাটে। - বিপদের আঁচ পেয়ে ব্রিটিশ সরকার কিংসফোর্ডকে মজঃফরপুরে বদলি করে পাঠালেন। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে সেখানে পাঠানো হ'ল। এবারেও ভাগ্যক্রমে কিংসফোর্ড রক্ষা পেয়ে গেলেন।

এর মধ্যে একদিন বারীন্দ্র লক্ষ্য করেন, মুরারীপুকুর বাগানের পাশের বাড়ীতে একদল নতুন লোক এসেছে। রাতদিন হৈ-হল্লাতে মেতে থাকে। সন্দেহ হয় বারীনের।—এই লোকগুলো পুলিশের গুপ্তচর নয় তো?—গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করে জানলেন ঐ বাড়ীতে কিছু লোক মিলে জুয়ার আড্ডা বসিয়েছে। রাতদিন জুয়া খেলাই তাদের কাজ।—নিশ্চিন্ত হন বারীন্দ্র ঘোষ।—এদিকে মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ক্ষুদিরাম ধরা পড়েছেন। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় বিপ্লবীদের গুপ্ত স্থানগুলিতে পুলিশের গোপন হানা। মুরারীপুকুর বাগানবাড়ীতেও বারীন ঘোষ সহ অন্যান্য বিপ্লবীরাও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে পাশের বাড়ীতে নতুন লোকজনের আনাগোনা ও জুয়ার আড্ডাতে অনেক বিপ্লবী সদস্যের সন্দেহ হয় 'পুলিশের গোপন ষড়যন্ত্র নয় তো!' তাঁরা দলনেতাকে প্রস্তাব দেন রাতারাতি এখানকার গুপ্ত সমিতি ভেঙ্গে সরে পড়া যাক্। কিন্তু বারীন্দ্র ঘোষ সহজে সম্মত হন না। তাঁদের

সমস্ত জীবনের সঞ্চয়, বোমা, বন্দুক, পিস্তল সব কিছু রয়েছে এখানে। এগুলো হাতছাড়া হয়ে গেলে তাঁদের বিপ্লবী কর্মসূচী কি করে তাঁরা সমাধা করবেন ?—তবুও সাবধানের মার নেই। তাই মাটি খুঁড়ে লুকিয়ে ফেলা হ'ল বোমা, বন্দুক, পিস্তল ইত্যাদি।

কিন্তু পুলিশের অভিনয়ের কাছে ঠকে গেলেন বারীন্দ্র কুমার। সেই রাত্রেই সশস্ত্র পুলিশ হানা দেয় মুরারীপুকুর বাগানবাড়ীতে। বারীন্দ্র-সহ অন্যান্য বিপ্লবীরা একে একে গ্রেফতার হলেন।—এরপর শুরু হ'ল 'আলিপুর বোমার মামলা'।

দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলতে থাকে, আর কারাগার জীবনের অমানুষিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকেন বিপ্লবীদল। দুর্জয় সাহসী বিপ্লবীদল কারাগারের কঠিন প্রহরাতেও এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।—তাঁরা ঠিক করলেন জেল ভেঙ্গে পালাতে হবে। কৌশল করে বারীন্দ্র ঘোষ দুটি রিভলবার সংগ্রহ করে মাটির নীচে লুকিয়ে রাখলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত জেল থেকে পালিয়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর বারীন ঘোষ সংগৃহীত ওই দুটি রিভলভার দিয়ে বিশ্বাসঘাতক রাজসাক্ষী নরেন গোস্বামীকে হত্যা করা হয়।

১৯০৯ সালে 'আলিপুর বোমার মামলা'র রায় বের হ'ল। বারীন্দ্র কুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে। মামলার রায় শুনে উদীয়মান ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ রাগে, ক্ষোভে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে ওঠেন, 'দেখি কে এদের ফাঁসি দেয়!'—হাইকোর্টে আপীল করা হ'ল। ফাঁসির বদলে হ'ল তাঁর দ্বীপান্তর।

এরপর স্বাধীনতা-স্বপ্নে বিভোর, দেশমাতৃকার শ্রীচরণে নিবেদিত প্রাণ বারীন্দ্র কুমার সাগরপারের নির্জন দ্বীপ আন্দামানের নিশ্ছিদ্র কারাগারে সুদীর্ঘ বারো বছর অশেষ যন্ত্রণায় কারাগার জীবন ভোগ করেন।



অরবিন্দ ঘোষ

[বিখ্যাত আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী শ্রীঅরবিন্দ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একজন বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সেকালের প্রখ্যাত ডঃ কৃষ্ণধন ঘোষ ও মাতা ছিলেন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি এবং স্বদেশী নেতা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কন্যা। ইউরোপীয় শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে মানুষ হয়েও অরবিন্দ ভারতবর্ষ ও ভারতীয় সনাতন ধর্মের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মাতৃভূমির পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের জন্য তিনি উতলা হয়ে ওঠেন। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার মাধ্যমে অরবিন্দ তাঁর স্বদেশচেতনা ও জাতীয়তার বাণী প্রচার করেন।—ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গ্রেফতার এড়ানোর জন্য অরবিন্দ ১৯১০ সালে পণ্ডিচেরীতে পালিয়ে যান। সেখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে যোগ-সাধনার' দ্বারা পৃথিবীর মানুষকে উন্নত জীবনের অধিকারী করার চেষ্টায় ব্রতী হন।—১৯৫০ সালে এই মহাযোগী বিপ্লবী নেতা লোকান্তরিত হন।]

১৯০৮ সাল। বিখ্যাত আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা চলছে। উনচল্লিশ জন স্বদেশভক্ত এই মামলায় অভিযুক্ত। উদীয়মান ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁদের পক্ষে সওয়াল করছেন। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন এক আত্মসমাহিত জ্যোতির্ময় পুরুষ।

এই মহাপুরুষটি হলেন শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, যিনি 'ঋষি অরবিন্দ' নামে অধিক পরিচিত। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫'ই আগস্ট কল'কাতা

শহরে তাঁর জন্ম হয়। অরবিন্দের পিতার নাম কৃষ্ণধন ঘোষ। সেকালে তিনি একজন বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। অরবিন্দের মাতা প্রখ্যাত পণ্ডিত ও স্বদেশীনেতা রাজনারায়ণ বসুর কন্যা।

অরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ তাঁর পুত্রদের ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি অতি অল্প বয়সেই অরবিন্দকে দার্জিলিং লরেটো স্কুলে ভর্তি করে দেন। এর দু' বছর পর কৃষ্ণধন ঘোষ অরবিন্দকে বিলাতে পড়াশোনার জন্য রেখে আসেন। সেদিন কৃষ্ণধন ঘোষ কল্পনাও করতে পারেননি বিলিতি সভ্যতায় লালিত এই শিশুটিই হবেন একদিন ভারতবর্ষের নবজাতীয়তাবাদের জনক, ঋষি অরবিন্দ।

অরবিন্দ ছাত্র হিসাবে মেধাবী ছিলেন। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় চল্লিশ পাউণ্ডের বৃত্তি পেয়ে তিনি ভর্তি হন কেম্‌ব্রিজের কিংস কলেজে। মাত্র আঠারো বছর বয়সে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু ঘোড়া চড়ায় অপটু ছিলেন বলে সিভিল-সার্ভিস-এর তালিকা থেকে তাঁর নাম কেটে দেওয়া হয়। এর ফলে অরবিন্দ উচ্চ সরকারী পদ থেকে বঞ্চিত হন। কিন্তু এতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি।—সিভিল সার্ভিস তালিকা থেকে অরবিন্দের নাম বাদ যাবার ফলেই হয়তো পরবর্তীকালে তাঁর জীবনধারা সম্পূর্ণ বদ্‌লে যায়।

সেই সময়ে বরোদার মহারাজা লণ্ডনে ছিলেন। অরবিন্দের মেধা ও অসাধারণ চারিত্রিক দৃঢ়তায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি বরোদার শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত করে তাঁকে ভারতে নিয়ে আসেন।—এরপর থেকেই অরবিন্দের জীবন-ধারা সম্পূর্ণ বদলে যায়। এই সময়ে তিনি একনিষ্ঠ ছাত্রের মন নিয়ে সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করে বেদ, উপনিষদের বাণী অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি পাঠ করে দেশ-জননীর রিক্তা মূর্তি প্রত্যক্ষ করে তিনি বেদনার্ত হয়ে ওঠেন। অরবিন্দ উপলব্ধি করেন, মাতৃভূমি ভারতবর্ষের

স্বাধীনতা আশু প্রয়োজন। পরাধীন জাতির গ্লানি ও বেদনায় তিনি উতলা হয়ে ওঠেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ বরোদার সম্মানিত পদ ত্যাগ করে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। অরবিন্দ মনে করতেন স্বদেশপ্রেম তাঁর জন্মগত। তিনি বলতেন, "অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলো মাঠ, ক্ষেত, বন, পর্বত, নদী বলিয়া জানে, আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।"

১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি লর্ড কার্জন 'বঙ্গ-ভঙ্গ' আদেশ জারী করলে সারা বাংলাদেশ জুড়ে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে শুরু হয়ে যায় অসহযোগ আন্দোলন। বিদেশী দ্রব্য বর্জন করা আরম্ভ হয়। ইংরাজ কর্তৃক শিক্ষালয় ছেড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল ছাত্র-ছাত্রীর দল। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোন রকম সহযোগিতা নয়। কিন্তু দেশীয় ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রয়োজন নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা ও নতুন শিক্ষালয়। প্রতিষ্ঠিত হ'ল "জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান"।—এই জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ-র দায়িত্বভার অরবিন্দ গ্রহণ করেন।

মাতৃভূমির প্রতি দেশবাসীকে সচেতন করে তোলার জন্য এবং জাতীয়তাবাদের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' নামক পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করে লেখনী ধারণ করেন। এই পত্রিকায় অরবিন্দের জ্বালাময়ী রচনা পড়ে দেশের তরুণদল নতুন নতুন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার মাধ্যমে তিনিই প্রথম ঘোষণা করলেন, ভারত ও ভারতবাসীর রাজনৈতিক লক্ষ্য হ'ল পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা।—অল্প দিনের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকারের শ্যেনদৃষ্টির শিকার হ'ল এই পত্রিকাটি। শীঘ্রই অরবিন্দ গ্রেফতার হলেন। কিন্তু সম্পাদক হিসাবে তাঁর নাম তখন পত্রিকা লেখা থাকত না। তাই প্রমাণ অভাবে কিছুদিনের মধ্যে অরবিন্দ মুক্তি পেলেন।

অরবিন্দের রাজনৈতিক কার্যকলাপ এখানেই থেমে থাকল না। প্রধানতঃ তাঁরই পরামর্শে ও নির্দেশে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্র কুমার ঘোষের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে মুরারী পুকুরের গুপ্ত সমিতি। বাইরে থেকে লোকে মনে করত এখানে কিছু সাধু সন্নাসী ধর্মীয় জীবনযাপন পালন করছেন ও ধর্মচর্চায় লিপ্ত আছেন। কিন্তু গোপনে এখানে বোমা তৈরি করা হতো ও সশস্ত্র আন্দোলনের বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হ'ত। বিপ্লবীরা কখনো কখনো এখানে আত্মগোপন করে থাকতেন। অথচ বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই।

সেই সময় পুলিশ আদালতের প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন কুখ্যাত কিংসফোর্ড সাহেব। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিচার হ'ত তার আদালতে। সে তো বিচার নয়, বিচারের নামে প্রহসন মাত্র। কিংসফোর্ড প্রায় প্রত্যেকটি বিচারে স্বদেশীদের অন্যায়ভাবে সাজা দিতেন।—মুরারীপুকুর গুপ্ত সমিতির বিপ্লবীরা কিংসফোর্ডের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। নিজেদের মধ্যে কিংসফোর্ডকে কেন্দ্র করে বিচার সভা বসে। প্রধান বিচারক স্বয়ং অরবিন্দ। বিচারে কিংসফোর্ডের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন শ্রীঅরবিন্দ।

বিপদের গন্ধ টের পেয়ে নিরাপত্তার জন্য ব্রিটিশ সরকার কিংসফোর্ডকে মজঃফরপুরে বদলি করে পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হত্যা করার জন্য ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে সেখানে পাঠানো হ'ল। কিন্তু কিংসফোর্ড সাহেব ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন এবং ক্ষুদিরাম পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন।—তারপর সমগ্র দেশ জুড়ে চলল ব্রিটিশ পুলিশের তাণ্ডব-লীলা। একে-একে ধরা পড়তে লাগলেন বিপ্লবীগণ। মুরারীপুকুর গুপ্ত সমিতিতেও সশস্ত্র পুলিশ চড়াও হলেন। বারীন্দ্রকুমার এবং উপস্থিত অন্যান্য বিপ্লবীগণও পড়লেন ধরা।

এবারের পুলিশের লক্ষ্যস্থল ক'লকাতার গ্রে স্ট্রীটের একটি বাড়ী। সেখানে রয়েছেন অরবিন্দ। পুলিশের সুপার ক্রেগনের নেতৃত্বে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী বাড়ীটি ঘিরে ফেলে।—ক্রেগান সাহেবের ধারণা

ছিল তিনি এসেছেন দুর্ধর্ষ বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করতে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই সাহেব বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যান। এত সংখ্যক সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে তিনি কাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন? —আসবাবহীন সামান্য একটা ঘরে ছেঁড়া মাদুরের উপর শুয়ে আছেন ঋষিকর্তা একজন ব্যক্তি।— ইনিই দুর্ধর্ষ বিপ্লবী নেতা অরবিন্দ! গ্রেপ্তার হলেন তিনি।

তারপর শুরু হ'ল আলিপুরের বিখ্যাত বোমার মামলা। সুদীর্ঘ এক বৎসর ধরে অরবিন্দকে সাধারণ কয়েকদিনের মত কারাজীবন ভোগ করতে হয়। এই এক বছরের কারাজীবন তাঁকে অধ্যাত্মজীবন গঠনে সাহায্য করেছিল। এখানে থাকাকালীন সাধনা ও যোগ অভ্যাসের দ্বারা অরবিন্দ মনকে এমন সংযত ও সংহত করেন যে, কারাগারের নিপীড়ন ও বন্ধন তাঁর কাছে মিথ্যা হয়ে যায়।

তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সবেমাত্র ব্যারিস্টারি শুরু করেছেন। তিনি অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করে নিষ্ঠার সঙ্গে মামলা পরিচালনা করেন। চিত্তরঞ্জন বিভিন্ন যুক্তিজাল বিস্তার করে মামলার জুরীদের বুঝিয়ে দেন, আজ তাঁরা যে ব্যক্তির বিচার করছেন, তিনি একজন মহাপুরুষ। তিনি এক বিশ্বপ্রেমিক ও মহাপণ্ডিত দার্শনিক।—বিচারক শেষপর্যন্ত অরবিন্দকে মুক্তি দেন।

মুক্তি পেয়ে পুনরায় নতুন উদ্যমে অরবিন্দ জাতীয়তার বাণী প্রচার করতে শুরু করেন। তিনি তপস্বীর ম'ত ভারত-সাধনায় নিজেকে যুক্ত করলেন।

কিছুদিন পর ভগিনী নিবেদিতার কাছ থেকে অরবিন্দ খবর পেলেন, শীঘ্রই তাঁকে ইংরাজ সরকার গ্রেপ্তার করবে। খবর পেয়েই তিনি ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে চলে যান। সেখান থেকে অরবিন্দ ১৯১০ সালের এপ্রিল মাসে গোপনে ক'লকাতা হয়ে স্টীমারে পণ্ডিচেরী চলে যান।

অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানকার নির্জন পরিবেশে তিনি যোগ-সাধনায় লিপ্ত হ'ন। সাধনা দ্বারা অরবিন্দ পৃথিবীর মানুষকে উন্নত জীবনের অধিকারী করার চেষ্টা আজীবন করে গেছেন।—

১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে বিপ্লবী ও সাধক অরবিন্দ নশ্বর দেহ ত্যাগ করে অমরলোকে যাত্রা করেন।



বাঘা যতীন

[বাঘা যতীনের প্রকৃত নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শুধু ছুরি হাতে বাঘ মেরেছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল বাঘা যতীন। এই নামেই তিনি অধিক পরিচিত।—তিনি ১৮৮০ সালে নদীয়া জেলার কুষ্ঠিয়া মহকুমার কয়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।—ছোটবেলা থেকেই তিনি অসীম সাহস ও শক্তির অধিকারী ছিলেন। অরবিন্দ প্রমুখ বিপ্লবী নেতারা কারারুদ্ধ হলে যতীন্দ্রনাথের উপর বাংলাদেশে বিপ্লব সংগঠিত করার দায়িত্ব এসে পড়ে।—তিনি মাত্র চারজন সঙ্গী নিয়ে বুড়ীবালাম নদীর তীরে টেগার্ট পরিচালিত পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে যে বীরত্বের পরিচয় দেন, তা' সেদিন ব্রিটিশ সরকারকেও অবাক করে দিয়েছিল।]

শিলিগুড়ি রেল স্টেশন। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এক সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান বাঙালী যুবক প্ল্যাটফর্ম থেকে এক গ্লাস জল সংগ্রহ করে রেল কামরাতে ফিরে আসছেন। সেই পথে কয়েকজন গোরা সৈন্যও আসছিল। ওরা নিছক কৌতূহল ও অবজ্ঞাভরে যুবকটিকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে যায়। ফলে যুবকটির হাত থেকে কাঁচের গ্লাসটা পড়ে গিয়ে ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল।—এত বড় অপমান নীরবে সহ্য করার পাত্র কিন্তু যুবকটি নন। তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে গোরা সৈন্যদের পথ আগলে দাঁড়ালেন এবং তাদের আচরণের কৈফিয়ৎ দাবী করলেন।

একজন নেটিভ কি-না গোরা সৈন্যদের কাছে কৈফিয়ৎ দাবীর স্পর্ধা রাখে? ক্ষেপে উঠল সাদা চামড়ার অধিকারী সৈন্যরা। তারা

একসঙ্গে যুবকটিকে আক্রমণ করল। কিন্তু যুবকটি বিচলিত হলেন না। প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে একে-একে সবাইকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। তারপর সদর্পে উঠে এলেন রেল কামরায়।

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে এই দৃশ্য শিলিগুড়ি স্টেশনে উপস্থিত সকলে দেখলেন। বাঙালী শুধু মার খায় না, ফিরিয়ে দিতেও জানে। তাঁরা আর ভাগ্যের হাতে দুর্বল প্রাণ সঁপে দেবেন না কোনমতেই।

এই অসীম বাঙালী যুবকটির নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি 'বাঘা যতীন' নামে সুপরিচিত! ছেলেবেলা থেকে ঘোড়ায় চড়া ও বন্দুক চালানোয় যতীন্দ্রনাথ বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। তাঁর দেহে যেমন ছিল অসাধারণ শক্তি, তেমনি ছিল অসামান্য সাহস। এই শক্তি ও সাহসের পরিচয় তিনি তাঁর জীবনে বারংবার দিয়েছেন।

একবার তাঁর জন্মস্থান কয়াগ্রামে খুব বাঘের উপদ্রব হয়। গ্রামবাসী বাঘের দৌরাত্ম্যে ভীত ও সন্ত্রস্ত। কিন্তু বাঘটিকে মেরে ফেলার মত সাহসী ব্যক্তি সেই গ্রামে কেউ ছিল না।—অনেকের নিষেধ সত্ত্বেও যতীন্দ্রনাথ তাঁর মামাতো ভাই-এর সঙ্গে একদিন বাঘ শিকারে বের হলেন। মামাতো ভাই-এর হাতে বন্দুক ও যতীন্দ্রনাথের কাছে শুধুমাত্র একটি ছোরা।

গ্রাম ছেড়ে বনের ধারে এসে দাঁড়ালেন দুই-ভাই। ওদিকে গ্রামের লোকেরা ক্যানেস্তারা পিটছে, ঢিল ছুঁড়ছে যাতে বাঘ ভয় পেয়ে বেরিয়ে আসে বন থেকে। হঠাৎ যতীন্দ্রনাথ দেখলেন কিছুটা দূরে বনের মধ্যে একটা জঙ্গলের ঝোপ নড়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যেই সেখান থেকে বাঘ বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের ভাই বন্দুক উঁচিয়ে গুলি করলেন। কিন্তু গুলি ঠিকভাবে বাঘটাকে বিদ্ধ করতে পারেনি। আহত হয়েছে মাত্র। আহত বাঘ ভীষণ হিংস্র হয়ে ওঠে। কোনরকম সুযোগ না দিয়ে বাঘ লাফিয়ে এসে পড়ল যতীন্দ্রনাথের ওপর। শুরু হ'ল বাঘে-মানুষে অসম দ্বন্দ্ব। বাঘ তার নখর দিয়ে সমানে আঘাত করছে যতীন্দ্রনাথকে। কখনো

খাবলে তূলে নিচ্ছে শরীরের মাংস। কিন্তু যতীন্দ্রনাথও কম নন। ছোরা দিয়ে একের পর এক আঘাত করে চলেছেন বাঘকে। এক সময় যতীন্দ্রনাথের ছোরার আঘাতে বাঘটির মৃত্যু হয়।

খালি হাতে বাঘ মেরে 'ফরিদ খাঁ' হয়েছিলেন শেরশাহ, আর ছুরি হাতে বাঘ মেরে যতীন্দ্রনাথ হলেন 'বাঘা যতীন'।

যতীন্দ্রনাথ ১৮৮০ সালে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমায় কয়াগ্রামে তাঁর মামার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বড় মামা ছিলেন কৃষ্ণনগরের একজন প্রখ্যাত উকিল। এখান থেকেই যতীন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। তারপর ক'লকাতায় সেন্ট্রাল কলেজে তিনি ভর্তি হন; কিন্তু অর্থাভাবের জন্য তাঁকে কলেজের পড়া ছেড়ে দিতে হয়। এরপর যতীন্দ্রনাথ সওদাগরি অফিসে চাকরি নেন। কিছুকাল পরে এই চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাংলা সরকারের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে শুরু হয়েছে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন। ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ বিপ্লবীদের প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতিগুলোর খবর সংগ্রহ করে হানা দিতে শুরু করে। ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন শ্রীঅরবিন্দ, ধরা পড়লেন অন্যান্য বিপ্লবী কর্মীরা। তাঁদের উপর চলতে থাকে ভয়ংকর নির্যাতন।

এই ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী ছাড়া আরেক দল রাজকর্মচারীরা, তারা ভারতীয় হয়েও, বিদেশী মনিবকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে দেশের ও বিপ্লবীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা শুরু করল।—ওরা পরাধীন দেশের নাগরিক হয়েও স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের ওপর নির্যাতন করতে কুণ্ঠা বোধ করল না।

অতএব এই ঘরশত্রু বিভীষণের দলকে শায়েস্তা করার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হ'লেন যতীন্দ্রনাথ।

শামসুল আলম। এই উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীটি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।—একদিন

হাইকোর্টের সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় অতর্কিত গুলির আঘাতে প্রাণ হারালেন।—গুলি করেছেন এক তরুণ ছাত্র— নাম বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত। বীরেন ধরা পড়লে তার উপর চলতে লাগল অসহ্য উৎপীড়ন। শেষ পর্যন্ত পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে স্বীকার করল, সে যে রিভলভার দিয়ে সামসুল আলমকে হত্যা করেছে তা যতীন্দ্রনাথের দেওয়া।—অল্প দিনের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন।

কিছুকাল পরে যতীন্দ্রনাথ মুক্তিলাভ করেন। পুলিশ কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেনি তাঁর বিরুদ্ধে। জেল থেকে বেরিয়ে এসে জেলাবোর্ডের ঠিকাদারি কাজ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে থাকেন। ঠিকাদারি কাজের আড়ালে যতীন্দ্রনাথ বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত সমিতি গড়ে তুলতে লাগলেন।

বাংলাদেশের বিপ্লবীরা তখন বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গেছে। এর মধ্যে প্রধান দুটি দল হ'ল যুগান্তর দল এবং অনুশীলন সমিতি। এই দলগুলির মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। যতীন্দ্রনাথ এই দলগুলিকে একত্রিত করে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে, অরবিন্দসহ অধিকাংশ বিপ্লবী নেতা বন্দী থাকার ফলে সশস্ত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই যতীন্দ্রনাথের ওপর এসে পড়ে।

১৯১৪ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংরাজদের প্রচণ্ড লড়াই।—এই সুযোগকে কাজে লাগাতে চাইলেন যতীন্দ্রনাথ। জার্মানীদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে তাঁরা ভারতবর্ষের ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিপ্লব বাধিয়ে তুলবেন। ভারতের বাইরে যেসব ভারতীয় বিপ্লবীরা রয়েছেন, তাঁরাও যতীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানালেন। ওঁরাও বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে ভারতীয় বিপ্লবীদেরকে পাঠাবেন—স্থির হয়, জার্মানী থেকে তিন জাহাজ অস্ত্র-শস্ত্র ভারতবর্ষে এসে পৌঁছোবে। এক জাহাজ

অস্ত্র আসবে বোম্বাই-এর কাছে। সে অস্ত্র যাবে দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে। একটি জাহাজ আসবে সুন্দরবনের মধ্যে রায়মঙ্গলে। এ অস্ত্র বাংলা আসাম অঞ্চলের বিপ্লবীরা ব্যবহার করবেন। আর-এক জাহাজ অস্ত্র পৌঁছোবে উড়িষ্যার বালেশ্বরে। এই জাহাজের অস্ত্র বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে বিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করবে। অস্ত্র এসে পৌঁছোলেই নির্দিষ্ট দিনে শুরু হবে সমগ্র ভারতব্যাপী আন্দোলন।— জার্মানের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত ইংরাজ শক্তি পারবে না এই সম্মিলিত আঘাত সহ্য করতে।

কিন্তু এই বিরাট কর্মযজ্ঞের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। নিরুপায় যতীন্দ্রনাথকে অর্থসংগ্রহের জন্য ডাকাতির আশ্রয় নিতে হয়।

এরপর স্থির করা হয়, যাতে ইংরাজ সরকার বাইরে থেকে সৈন্য না আনতে পারে, সেজন্য তিনদিকের রেল-লাইন উড়িয়ে দেওয়া হবে। —মাদ্রাজ লাইন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে যাত্রা করেন বালেশ্বরে। তাছাড়া, সংবাদ এসেছে, অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে জার্মান জাহাজ কয়েকদিনের মধ্যেই এসে পৌঁছোবে বালেশ্বরের কাছে মহানদীর মোহনায়।

মাত্র চারজন সঙ্গী নিয়ে যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বর থেকে কুড়ি মাইল দূরে কোপ্‌তিপোদার জঙ্গলে আত্মগোপন করে আছেন। এই সঙ্গী চারজন হলেন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও জ্যোতিষ পাল।

এদিকে ইংরাজ পুলিশবাহিনী যতীন্দ্রনাথকে হন্যে হয়ে খুঁজছেন। শীঘ্রই যতীন্দ্রনাথের বালেশ্বর গমনের সংবাদ পুলিশ জানতে পারে। ফলে, পুলিশের বড়কর্তা টেগার্ট সাহেব বিপুল পুলিশবাহিনী নিয়ে বালেশ্বরের দিকে রওনা হলেন। যতীন্দ্রনাথ এ খবর জানতেও পারলেন না। তখন তাঁরা বনের মধ্যে আত্মগোপন করে আছেন। কিন্তু আশেপাশের গ্রামবাসীরা টের পেয়ে যায় তাঁদের উপস্থিতি। এদিকে পুলিশ এই সময় সর্বত্র প্রচার করে, একদল বাঙালী ডাকাত

এ অঞ্চলে লুকিয়ে আছে, সাবধান। এতে গ্রামবাসীরা প্ররোচিত হয়ে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের গোপন আস্তানার কথা পুলিশকে জানিয়ে দেয়। ফলে, টেগার্টের পরিচালনায় পুলিশ এগুতে থাকে প্রায় পায়ে পায়ে।

গ্রামের লোকদের আচরণ দেখে যতীন্দ্রনাথের সন্দেহ হয় এবং বুঝতে পারেন এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করা প্রয়োজন। কিন্তু বিধি বাম। সঙ্গীদের মধ্যে একজন কার্বঙ্কল রোগে ও কঠিন জ্বরে আক্রান্ত। রোগাক্রান্ত সঙ্গী যতীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন তাঁকে ফেলে রেখে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে। কিন্তু অসুস্থ সঙ্গীকে অসহায়ভাবে ফেলে রেখে চলে যেতে যতীন্দ্রনাথের মন সায় দিল না। অতএব শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়ানো ছাড়া আর কোন পথ নেই। সম্মুখ-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন যতীন্দ্রনাথ। বুড়ীবালাম নদীর তীরে তৈরি করলেন পরিখা। সেই পরিখার মধ্যে তাঁরা আশ্রয় নিয়ে শত্রুর অপেক্ষায় রইলেন।

অবশেষে এল সেই চরম মুহূর্ত নির্জন বুড়ীবালামের তীর মুখর হয়ে উঠল গুলির শব্দে। একদিকে ব্রিটিশ পুলিশ আর অন্যদিকে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর চার সঙ্গী। ব্রিটিশ পুলিশ জানে বিপ্লবীদের অস্ত্র-সংখ্যা সীমিত। এই সীমিত অস্ত্র দিয়ে বিপ্লবীরা বেশীক্ষণ যুদ্ধ চালাতে পারবেন না। কিন্তু গুলির বিনিময়ে গুলি চালিয়ে সমানে প্রত্যুত্তর দিয়ে চলেছেন বাংলার বীর সন্তানেরা যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে। হঠাৎ একটা গুলি এসে বিদ্ধ করল চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর বুকে। নেতা যতীন্দ্রনাথ একটু স্তব্ধ হয়ে তাকালেন প্রিয় সঙ্গীর দিকে। মুহূর্তের অসতর্কতা। প্রথমে একটি গুলি এসে বিঁধল উরুতে এবং পরেরটা তাঁর পেটে। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লেন। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেন শিথিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখনই থেমে গেলে চলবে না। যতক্ষণ একটিমাত্র গুলি অবশিষ্ট থাকবে. ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু একসময় গুলি ফুরিয়ে যায়। উপায়-

হীন যতীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন। চিত্তপ্রিয় ততক্ষণে আর বেঁচে নেই।

যতীন্দ্রনাথ, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও জ্যোতিষ পাল সকলেই আহত। পুলিশ প্রহরায় তাঁদের বালেশ্বর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হ'ল।

চার্লস টেগার্ট হাসপাতালে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। উদ্দেশ্য বিপ্লবীদের গুপ্ত খবর যতীন্দ্রনাথের কাছ থেকে জানা যায় কি-না। —তখন যতীন্দ্রনাথ মৃত্যুর মুখোমুখি! "জল, একটু জল,"—তৃষ্ণার্ত কণ্ঠে অস্পষ্ট উচ্চারণে বলে ওঠেন যতীন্দ্রনাথ! টেগার্ট তখন নিজেই জলের গ্লাস এগিয়ে ধরলেন তাঁর মুখে। মৃত্যুপথযাত্রী যতীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নেন।—না, টেগার্টের হাতের জল তিনি মৃত্যুর সময় পান করে ঋণী হবেন না। "না, না, শত্রুর হাতে দেওয়া জল, আমি স্পর্শ করব না।"—এই শেষ কথাটি কোনরকমে উচ্চারণ করে যতীন্দ্রনাথ মৃত্যুর কোলে চিরতরে ঢলে পড়েন।



প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

[প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বাংলার অন্যতম নারী বিপ্লবী ও শহীদ। তিনি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রীতিলতা ছাত্রী হিসাবে মেধাবী ছিলেন। তিনি ১৯৩০ সালে ঢাকা বোর্ডের আই. এ. পরীক্ষায় মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিষ্টিংশন নিয়ে বি. এ. পাশ করেন। কর্মজীবনে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রামের 'নন্দন কানন গার্লস স্কুলে'র প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।—তাঁর সংগ্রামী জীবনে মাষ্টারদা সূর্য সেনের প্রভাব অপরিসীম। কলকাতা থাকাকালীন সূর্য সেনের নির্দেশে ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দূর সম্পর্কের দিদির ছদ্ম পরিচয়ে আলিপুর জেলে যোগাযোগ রাখতেন।—১৯৩২ সালের ১২ই জুন তারিখে ধলঘাট নামক স্থানে ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ সাহেবের পরিচালনায় ইংরাজ পুলিশবাহিনীর সঙ্গে ধলঘাট নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, সেখানে সূর্য সেন প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে প্রীতিলতাও অংশ গ্রহণ করেন। ঐ বৎসরই ২৪শে সেপ্টেম্বর কয়েকজন বিপ্লবীকে নিয়ে প্রীতিলতা 'পাহাড়তলী ইওরোপীয়ান ক্লাব' আক্রমণ করেন এবং মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি রণাঙ্গনেই বিষপান করে শহীদ হন।]

মাষ্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারে বিপ্লবীরা যে আক্রমণ হেনেছিলেন ও অস্ত্র-শস্ত্র লুণ্ঠন করেছিলেন, তার প্রতিশোধ নিতে সে সময় ইংরাজ শাসকগোষ্ঠী উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। সমগ্র চট্টগ্রাম জুড়ে শুরু হয়েছিল তাদের নির্মম অত্যাচার। হিংস্র পশুর মতো ইংরাজ পুলিশবাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিত প্রাণ বিপ্লবীরাও চুপচাপ বসেছিলেন না। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। রাতের অন্ধকারে বিপ্লবীদের গোপন আস্তানায় বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে স্থির হয়, পাহাড়তলী ইওরোপীয়ান ক্লাবে আক্রমণ চালিয়ে বিপ্লবীদের প্রতি ইংরাজ প্রভুদের নির্দয় অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে হবে।—এই পাহাড়তলী ইওরোপীয়ান ক্লাবে ইংরাজ রাজপুরুষেরা আমোদ-প্রমোদের জন্য জড়ো হতেন। দলপতি বিপ্লবী সদস্যদের কাছে জানতে চাইলেন, "কে এই দায়িত্ব গ্রহণ করবে, এগিয়ে এসো।"

ধীর গতিতে অথচ দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দলপতির কাছে এগিয়ে এলেন বিপ্লবী দলের সদস্যা এক তরুণী। বললেন, "আমাকে এই দায়িত্ব-ভার অর্পণ করুন।"

বিস্ময়ে অভিভূত দলপতি সূর্য সেন, তাঁর মন্ত্রশিষ্যা তরুণীকে বললেন, "তুমি পারবে এই মরণপণ অভিযানকে সফল করে তুলতে!"

—"নিশ্চয় পারবো। যারা দেশজননীকে শৃঙ্খলিত করে দেশের সন্তানদের স্বাধীনতা হরণ করেছে, তাদের আমি ভয় করি না। আমার সমস্ত ঘৃণা দিয়ে এর প্রতিশোধ আমি নেব।—আসুক বাধা আর বিপদ। আমার এই তুচ্ছ জীবন দেশমাতার শ্রীচরণে উৎসর্গ করতে আমি চাই।"—নির্ভীক চিত্তে তরুণীটি তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানালেন দলনেতাকে।

জহুরী চোখে এই মেয়ের বুকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখে পরম নিশ্চিন্তে দলপতি সূর্য সেন এই তরুণীকে পাহাড়তলী ইওরোপীয়ান ক্লাবে হানা দেওয়ার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

দেশ-জননীর শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই অসীম সাহসী তরুণীটির নাম প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। মা তাঁকে আদর করে "রাণী" নামে ডাকতেন।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ১৯১১ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার ও মাতার নাম প্রতিভাময়ী

দেবী। প্রীতিলতার সমসাময়িক কালে চট্টগ্রামে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া শেখার বিশেষ রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু প্রীতিলতা শিশুকাল থেকেই পড়াশোনার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতেন। শিশুকালে, তিনি লক্ষ্য করতেন মাষ্টারমশাই এসে তাঁর দাদাদের নিয়মিত পড়ান। একদিন মাষ্টার মশায়ের কাছে তিনিও বায়না ধরলেন পড়বার জন্য। মাষ্টার মশায় না পড়িয়ে পারলেন না।—এইভাবে প্রীতিলতার শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল।

পড়াশোনায় তিনি মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। ১৯৩০ সালে ঢাকা বোর্ডের আই. এ. পরীক্ষায় মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৩২ সালে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিস্টিংশন নিয়ে বি. এ. পাশ করেন। এরপর প্রীতিলতা চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে নন্দন কানন গার্ল'স স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ছাত্রী জীবনে ঢাকায় লীলা নাগের "দীপালি সংঘ" এবং কলকাতায় কল্যাণী দাসের "ছাত্রী সংঘ"-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত ছিলেন। এই দু'টি সংঘই ভারতবর্ষের পরাধীনতা দূর করার প্রয়াসে প্রেরণা ও শিক্ষা দান করত।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর প্রীতিলতা সূর্য সেনের প্রভাবে আসেন এবং ছাত্রী-থাকাকালীন ক'লকাতায় বিপ্লবীদলের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।—এই সময়ে সূর্য সেনের নির্দেশে ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত চট্টগ্রামের বিপ্লবী তরুণ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দূর সম্পর্কের বোনের ছদ্ম-পরিচয়ে আলিপুর জেলে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। সমস্ত রকম বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রীতিলতা জেলে বহুবার সাক্ষাৎ করেছেন মৃত্যুপথযাত্রী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে।—এই সাক্ষাৎগুলি তাঁর জীবনকে বিপ্লবের পথে দুর্জয় বেগে ঠেলে দিয়েছিল।

পলাতক মাষ্টারদা সূর্য সেন যখন ধলঘাট গ্রামে সাবিত্রী দেবীর বাড়ীতে আত্মগোপন করে ছিলেন, তখন প্রীতিলতা পুরুষের ছদ্মবেশে

মাঝে মধ্যে সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। সাবিত্রী দেবীর বাড়ীতে সূর্য সেন অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে গোপন আলোচনা করতেন। এই আলোচনাতেও প্রীতিলতা অংশ গ্রহণ করতেন।

১৯৩২ সালের ১২'ই জুন। তখন রাত প্রায় দশটা। আলোচনা শেষে সূর্য সেন, নির্মল সেন, অপূর্ব সেন এবং প্রীতিলতা সাবিত্রী দেবীর বাড়ীর নীচের তলার ঘরে খেতে যাবেন। এমন সময় সন্ত্রস্ত হয়ে সাবিত্রী দেবী ওপর তলাতে এসে চাপাকণ্ঠে খবর দিলেন "পুলিশ—বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। সাবধান!"

সবার সঙ্গেই রিভলভার আছে। প্রীতিলতাও রিভলভার নিয়ে প্রস্তুত হলেন পুলিশের মুখোমুখি হ'তে। ভীষণ সঙ্কট-মুহূর্ত। যে-কোন সময় অঘটন কিছু ঘটে যেতে পারে। পালাবার কোন উপায় নেই। বাড়ীর চারদিকই ইংরাজ-পুলিশবাহিনী ঘিরে ফেলেছে। সূর্য সেন প্রীতিলতাকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে নীচে গিয়ে সাবিত্রী দেবীর আত্মীয়া বলে নিজের পরিচয় দেন।

কিন্তু প্রীতিলতা এই সঙ্কট-মুহূর্তে তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে নিজে নিরাপদে যেতে চাইলেন না। প্রীতি মাষ্টারদাকে অনুরোধ করেন, "জীবনের এই সন্ধিক্ষণে আমাকেও আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে মরবার সুযোগ দিন।"

এরকম সঙ্কট-মুহূর্তে দলনেতার আদেশ মান্য করাই বিপ্লবীদের কর্তব্য। তাই প্রীতিলতাকে নীচের তলায় সাবিত্রী দেবীর কাছে চলে আসতেই হয়।

এদিকে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত ক্যাপ্টেন ক্যামেরন বিপ্লবীদের ধরার জন্য দোতলায় উঠে এলেন। তার কাছে বিশ্বস্ত খবর আছে, সাবিত্রী দেবীর বাড়ীর দোতলায় কতিপয় বিপ্লবী আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু দোতলায় উঠবার মুখেই বিপ্লবী নির্মল সেনের গুলিতে ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের প্রাণহীন দেহ গড়িয়ে নীচে পড়ে যায়।—তারপর

কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ। বিপ্লবীরা অন্ধকারে পালিয়ে যেতে চাইলেন। ইংরাজ পুলিশবাহিনী বাড়ীটাকে কিভাবে ঘিরে রেখেছে তা লক্ষ্য করার জন্য নির্মল সেন টিনের ছাদের কিনারায় এলে একটু শব্দ হয় এবং সেই শব্দ লক্ষ্য করে পুলিশ গুলি চালাতে থাকে। একটি গুলি নির্মল সেনের বুকে এসে লেগে তাঁকে চিরতরে নিস্পন্দ করে দেয়।

অতি সন্তর্পণে মাষ্টারদা, সূর্য সেন ও প্রীতিলতা বাড়ীর পিছন দিয়ে পালানোর সুযোগ নিতে চেষ্টা করেন। তাঁরা পা টিপে টিপে অন্ধকারের মধ্যে পাটিপাতার ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে চলতে থাকেন। কিন্তু ঝোপ-ঝাড়ের ঝরে যাওয়া শুকনো পাতাগুলি পদ-দলিত হয়ে মচ্-মচ্ শব্দ করে ওঠে। পুলিশবাহিনী শুকনো পাতার শব্দ পেয়ে সেদিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। গুলি লেগে অপূর্ব সেন প্রাণ হারালেন।— বিপ্লবীদের পিছন ফিরে তাকাবার সুযোগ নেই। মাস্টারদা ও প্রীতিলতা অন্যতম দুটি সঙ্গীকে চিরতরে বিদায় দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিরাপদে পালিয়ে যেতে সমর্থ হলেন।

ইংরাজ সরকার ঘোষণা করল, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে ধরিয়ে দিতে পারলে প্রচুর অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে।

প্রীতিলতা প্রায় তিন মাস মাষ্টারদার সঙ্গে আত্মগোপন করেছিলেন। সেই সময়েই সূর্য সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন 'পাহাড়তলী ইওরোপীয়ান ক্লাব' আক্রমণ করা হবে। এই অভিযানের জন্য প্রীতিলতাকে দলনেত্রী করা হয়।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর। গভীর রাত্রি। পুরুষের বেশে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এগিয়ে চললেন প্রীতিলতা পাহাড়তলীর উদ্দেশ্যে। তাঁর সঙ্গে চলেছেন আরও কয়েকজন বিপ্লবী বীর। তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্ব-পরিকল্পনা মত নির্দেশিত স্থানে এসে পৌঁছোলেন। দলনেত্রী দেশজনীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানালেন একমুঠো

মাটি নিজের কপালে লেপে দিয়ে। তারপর সঙ্গীদের ইশারা করলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁদের অস্ত্র গর্জে উঠল।

ইংরেজরা আগে থেকেই অনুমান করেছিল তাদের ক্লাব আক্রান্ত হ'তে পারে। তাই তারা সতর্ক হয়েই ছিল। তাই বিপ্লবী দল আক্রমণ করতেই চারদিক থেকে বেরিয়ে এল উপস্থিত সশস্ত্র ইংরেজরা।

শুরু হল খণ্ডযুদ্ধ। রিভলভার ও বন্দুকের গুলিতে উভয় পক্ষের অনেকেই লুটিয়ে পড়লেন। পাহাড়তলীর মাটি মানুষের রক্তে লাল হয়ে উঠল।

প্রীতিলতা নিপুণ সৈনিকের মতো গুলি চালাতে লাগলেন। কিন্তু সংখ্যায় ইংরেজরা ছিল প্রচুর। তাই কিছুক্ষণের মধ্যে বিপ্লবীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো।

এবারে দলনেত্রী কি করবেন? পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন কি? কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া তো সৈনিকের ধর্ম নয়। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা প্রীতিলতা কাপুরুষের মতো ইংরাজদের হাতে জীবিত অবস্থাতে ধরা দিতেও চান নি। ইংরাজদের হাতে ধরা পড়ার গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অন্য কোন উপায় না দেখে সেখানেই প্রীতিলতা বিষপান করে শহীদ হলেন।—মাত্র একুশ বছর বয়সে বাংলার বীর নারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার দেশের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে ভারতবাসীর অন্তরে অমর হয়ে রইলেন।



শহীদ কানাইলাল দত্ত

[অসীম সাহসী ও দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী কানাইলাল দত্ত দেশমাতৃকার সেবায় নিবেদিত এক প্রাণ।—তিনি ১৮৮৭ সালের জন্মাষ্টমীর দিনে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মাষ্টমীর দিনে জন্মে ছিলেন বলে তাঁর নাম 'কানাই' রাখা হয়।—শৈশবকাল থেকেই তিনি স্বাধীনচেতা ও সত্যের পূজারী ছিলেন। চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের ছাত্র থাকাকালীন সময় থেকেই ক্রমশঃ তাঁর মনে গভীর স্বদেশানুরাগ জন্মাতে থাকে। পরাধীন ভারতবর্ষের জন্য তাঁর হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠত।—বিপিন পালের 'নিউ ইণ্ডিয়া' ও অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা তাঁকে স্বদেশ-চেতনায় অনুপ্রাণিত করে।—বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন যখন শুরু হয়, তখন থেকেই কানাইলাল দত্ত দেশসেবায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। —মুরারীপুকুর গুপ্ত সমিতিতে তিনি যোগ দেন এবং গোপনে বোমা তৈরির কারখানায় তিনি যোগ দেন। সেখান থেকেই অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনিও গ্রেপ্তার হন। জেলের অভ্যন্তরে রাজসাক্ষী নরেন গোস্বামীকে হত্যা করার পরিকল্পনায় তিনি সত্যেন্দ্রনাথের সহযোগী হন।—১৯০৮ সালের ১০ই নভেম্বর কানাইলালের ফাঁসি হয়।]

ফাঁসীর আদেশপ্রাপ্ত বিপ্লবী এক তরুণ। আর মাত্র ক'দিন পরেই তাঁর ফাঁসি হবে। অথচ তাঁর যেন উদ্বেগ নেই, চিন্তা নেই। সে সদাহাস্যময়। জেলের প্রহরীরা ভাবে, 'এ আবার কোন্ ধরনের মানুষ! ভয়ও নেই, চিন্তাও নেই।' একজন ইংরাজ প্রহরী কৌতূহল দমন না করতে পেরে মৃত্যুপথযাত্রী সেই তরুণকে তো জিজ্ঞেস করেই ফেলল, তোমার মুখে এ সময় হাসি আসে কি করে? তোমার

কি এতটুকুও ডর লাগে না।' হাসতে হাসতে তরুণ বিপ্লবী জবাব দেন 'তুমি দেখো প্রহরী, ফাঁসীর পূর্ব-মুহূর্তেও আমি এমন করেই হাসব। দেশমায়ের জন্য আত্মদান, এ-তো আমার সৌভাগ্য ?'

সে কথা কিন্তু বিপ্লবী তরুণটি ভুলে যান নি।

ফাঁসির সমস্ত আয়োজন শেষ। ফাঁসির আসামীকে কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফাঁসি মঞ্চের দিকে। চারদিকে সশস্ত্র প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁসি মঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠে মুখের কালো পর্দা নিজের হাতে সরিয়ে তরুণটি প্রহরীর দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন, 'এই দেখ, বাঙালীর ছেলে তাঁর মাতৃভূমির জন্য হাসতে হাসতে মরতে পারে কি-না !'

মৃত্যুভয়হীন স্বদেশানুরাগী এই-বিপ্লবী তরুণটির নাম কানাইলাল দত্ত।

১৮৮৭ সালের জন্মাষ্টমীর দিনে কানাইলাল দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। জন্মাষ্টমীর দিন জন্মেছেন বলে তাঁর 'কানাই' নাম রাখা হয়।

কানাইলাল দত্ত শৈশব কাল থেকেই অসীম সাহসী ও দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সত্যের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ।

একবার গ্রীষ্মের দিনে, কিশোর কানাইলালের সমবয়সী ছেলেরা ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল। কানাইও ছেলেদের সঙ্গী হতে চাইলে তাঁর বাবা বারণ করেন। কিন্তু ঘুড়ি ওড়ানো দেখার লোভ সংবরণ করতে না পেরে তিনি লুকিয়ে ছাদে গেলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে ঘুড়ি ওড়ালেন না।—তিনি ঘুড়ি উড়িয়েছেন মনে করে তাঁর বাবা তিরস্কার করলে কানাইলাল বলেন, 'আমি নিজে ঘুড়ি ওড়াইনি, তবে ওড়ানো দেখার জন্য ছাদে গিয়েছিলাম।'—বাবা ছেলের কথা ঠিক বিশ্বাস করতে না পেরে চপেটাঘাত করলেন। অভিমানক্ষুব্ধ বালক কানাইলাল ভেঙ্গে পড়েন। বাবা তাঁর কথা বিশ্বাস করেন নি—এই অভিমান কিশোর হৃদয়ে অনেকদিন গাঁথা ছিল। পরে তাঁর বাবা খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন, সত্যিই সেদিন কানাইলাল ঘুড়ি ওড়ান নি।

কানাইলালের বাড়ীর কাছে চটকল কোম্পানীর একদল সাহেব প্রায় রাত্রেই মদ খেয়ে হল্লা করত। এতে পাড়ার লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও মুখে কিছু বলার সাহস তাদের ছিল না। এক রাত্রে অসহ্যবোধ হওয়াতে কানাইলাল সোজা তাদের সামনে গিয়ে মদ খেয়ে হল্লা করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু সাহেবরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না, বরং তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দেয়।—তীব্র ক্রোধে ফেটে পড়েন কানাইলাল। লাফিয়ে পড়ে তিনি মুষ্টিঘাতে তিনজন সাহেবকে ধরাশায়ী করে দেন। এই দেখে অন্য সাহেবরা পালিয়ে বাঁচে।—এমনই ছিল কানাইলালের অন্যায়কে প্রতিরোধ করার নির্ভীক মানসিকতা।

একবার এক বিলাতী সার্কাস দল খেলা দেখাবার জন্য চন্দননগরে এসেছিল। তারা সাদা-কালোর তফাৎ রেখে দর্শকদের বসবার ব্যবস্থা করেছিল। স্বদেশানুরাগী কানাই ভারতবর্ষীয় মানুষদের জন্য এমন অপমানজনক ব্যবস্থা মেনে নিতে পারলেন না। প্রতিবাদ জানানোর জন্য সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে পিকেটিং শুরু করলেন। সার্কাস কোম্পানীর ম্যানেজার এতে রেগে গিয়ে কানাইলালকে মারার জন্য তেড়ে এল।—কানাইলাল সাহেবের এই ঔদ্ধত্যকে ক্ষমা করতে পারলেন না। ঝাঁপিয়ে পড়ে কানাইলাল সাহেবের মুখে মারলেন এক ঘুষি।—এমন স্বভাবের মানুষ ছিলেন এই কানাইলাল দত্ত।

১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠল সমগ্র বাংলাদেশ। চন্দননগরেও এসে পৌঁছালো সেই আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গরাশি।—কানাইলাল তখন চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের ছাত্র। তিনিও অন্যান্যদের সঙ্গে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে পথে পথে জাতীয় সংগীত গেয়ে জনসাধারণের মনে স্বদেশ-চেতনা জাগরিত করার চেষ্টায় ব্রতী হন। বিলাতী দ্রব্য বর্জনের আহ্বান তাঁর কণ্ঠে সরব হয়ে ওঠে।

এইভাবেই ক্রমশঃ কানাইলাল দত্ত ভারতবর্ষের পরাধীনতা মোচনের জন্য বিপ্লবী সৈনিকের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ওঠেন। তাছাড়া, এইসময়ে তিনি চারুচন্দ্র রায়ের সংস্পর্শে এসে দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন।

বিপিন পালের 'নিউ ইণ্ডিয়া' ও অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা কানাইলালকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। এই সময়ে তিনি মুরারীপুকুর গুপ্ত সমিতির খবর জানতে পারেন এবং স্থির করেন এই সমিতিতে যোগদান করে দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করবেন। —মুরারীপুকুর গুপ্ত সমিতির নেতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁকে দলে টেনে নেন।

মুরারীপুকুরে কানাইলাল বেশীদিন থাকেননি। কুলীদের সাথে মিশে গোপন সমিতি গড়ে তোলার কাজে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে চলে যেতে হয় চট্টগ্রামে। সেখানে গিয়ে কুলীর ছদ্মবেশ ধারণ করে তাদের মধ্যে কাজ করতে শুরু করে দিলেন। কিন্তু তাঁর চোখের চশমা ছদ্মবেশ ধারণের পক্ষে অসুবিধা হয়ে দাঁড়াল। অগত্যা কানাইলাল ফিরে এলেন মুরারীপুকুর গুপ্ত সমিতিতে। তারপর নিযুক্ত হলেন গোপনে বোমা তৈরির কারখানায়। অল্পদিনের মধ্যে সেখান থেকে কানাইলাল দত্ত অন্যান্যদের সাথে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন।—শুরু হ'ল ঐতিহাসিক আলিপুর বোমার মামলা।

গ্রেফতার হওয়ার পর কিছুটা মুষড়ে পড়েন কানাইলাল। দেশের জন্য তেমন কোন কাজ তাঁর করা হল না। আত্মগ্লানিতে ভেঙ্গে পড়েন।

দীর্ঘদিন ধরে 'আলিপুর বোমার মামলা' চলতে থাকে। এর মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ জেল ভেঙে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে দুটি রিভলবারও কৌশলে বাইরে থেকে সংগ্রহ করেন।

এইসময় একটা অঘটন ঘটল। নরেন গোস্বামী নামে একজন

বিপ্লবী দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজসাক্ষী হয়ে গেল। নিরাপত্তার জন্য জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ইওরোপীয়ান জেল হাসপাতালে সরিয়ে এনে রাখল।

রাজসাক্ষী হওয়াতে অন্যান্য বিপ্লবীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন নরেন গোস্বামীর ওপর। বিপ্লবীরা এই বিশ্বাসঘাতকতার উচিত শিক্ষা দিতে চান। তাঁরা স্থির করেন, নরেনকে হত্যা করে বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি দিতে হবে।

অপর একজন বিপ্লবী বন্দী সত্যেন্দ্রনাথের ছিল হাঁপানী রোগ। পূর্ব-পরিকল্পনা মত সত্যেন্দ্রনাথ জেলের ডাক্তারকে বলেন "হাঁপানী রোগ যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। নরেনের মত আমিও রাজসাক্ষী হয়ে কারাগার থেকে মুক্তি পেতে চাই। কিন্তু তার আগে একবারের জন্য নরেনের সাথে আমার দেখা হওয়া প্রয়োজন, যাতে আমাদের বিবৃতি একই রকম হয়।"

ব্রিটিশ পুলিশ এটাই চাইছিল। যত বেশী সংখ্যক রাজসাক্ষী হবে, তত বিচারাধীন বিপ্লবীদের কড়া শাস্তি দিতে সুবিধে হবে। তাছাড়া, বিপ্লবীদের মনোবলও ভেঙে যাবে।

জেল কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি করে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে নরেন গোস্বামীর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন। দু'জনে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা করে স্থির করেন ক'দিন পর তাঁরা আবার একত্রিত হয়ে তাঁদের বিবৃতি লিখবেন।

এর মধ্যে একদিন পেটের যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকেন কানাইলাল। ডাক্তার এলেন ও প্রাথমিক কিছু ঔষধপত্র তাঁকে খেতে দিলেন। কিন্তু কিছুতেই কানাইলালের পেটের যন্ত্রণা কমে না। অগত্যা ডাক্তারবাবু কানাইলালকে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন। হাসপাতালে যাবার সময় কম্বলের নীচে শুয়ে থেকে কোমরে গুঁজে রাখলেন বারীন্দ্রকুমারের সংগৃহীত রিভলবার।

পরের দিন সত্যেন্দ্রনাথ হাসপাতালের দোতলায় নরেনের জন্য

অপেক্ষা করে থাকেন।—ওই তো নরেন আসছে তাঁর কাছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলেন সব ঠিকঠাক আছে কি-না। দাঁত মাজার অছিলায় নীচে কানাইলাল পায়চারি করছেন।

নরেন সামনে আসতেই সত্যেন্দ্রনাথের হাতের রিভলভার গর্জে উঠল বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে। রিভলভারের গুলি নরেন গোস্বামীর হাঁটুতে লেগেছে। "বাঁচাও, বাঁচাও" বলে আর্তনাদ করতে করতে প্রাণভয়ে ভীত নরেন গোস্বামী ছুটতে থাকে।—কিন্তু ওদিকে কানাইলালও প্রস্তুত। চারদিকেই হৈ-চৈ পড়ে যায়। পাগলাঘণ্টা বেজে ওঠে জেলের অভ্যন্তরে। প্রহরীরাও হঠাৎ এরকম অপ্রত্যাশিত ঘটনায় দিশাহারা হয়ে এদিক-সেদিক দৌড়াতে শুরু করে।—এদিকে ততক্ষণে ছুটতে ছুটতে নরেন গোস্বামী পড়ে যায় এক নর্দমার ওপর। ঝাঁপিয়ে পড়েন কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁদের রিভলভারের সব কটি গুলি নরেন গোস্বামীকে বিদ্ধ করে। রক্তাক্ত নরেনের মৃতদেহ পড়ে থাকে নর্দমায়।

শূন্য রিভলভার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একবারের জন্য বিশ্বাসঘাতক নরেনের দিকে তাকিয়ে দেখেন- এরকমটাই তাঁরা চেয়েছিলেন। আর কেউ যেন বিশ্বাসঘাতকতা করার সাহস না পায়।

সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলালকে ধরে ফেলে। —সেদিন তারিখ ছিল ১৯০৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর।

তারপর বিচার-পর্ব। কোন উদ্বেগ নেই তাঁদের মধ্যে। ১০ই নভেম্বর কানাইলালের ফাঁসির দিন ধার্য হয়েছে। অচঞ্চল চিত্তে নির্ভীক কানাইলাল বিচারের রায়কে মাথা পেতে স্বাগত জানালেন। যাক্— জীবনটা একেবারে ব্যর্থ হয়নি, দেশের জন্য ক্ষুদ্র হলেও, একটা কাজ তাহলে করতে পেরেছেন।

তারপর, নির্দিষ্ট দিনে, নির্ধারিত সময়ে হাসতে হাসতে ফাঁসি-মঞ্চে এগিয়ে গেলেন।—স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে রইল বাঙলার বীর সন্তান কানাইলালের নাম।



বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী

[মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রশিষ্যা মাতঙ্গিনী হাজরা মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার হোগলা নামক গ্রামে এক সাধারণ চাষীর পরিবারে জন্মেছিলেন। তাঁর জন্মসাল নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন তিনি জন্মেছিলেন ১৮৭০ সালে, আবার কেউ বলেন ১৮৮০ সালে তাঁর জন্ম হয়।—মাতঙ্গিনীদেবী শৈশবে লেখাপড়া শেখার কোন সুযোগ পাননি। অতি অল্প বয়সে পাশের আলিনান গ্রামের ত্রিলোচন হাজরার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু মাত্র আঠারো বছর বয়সে বিধবা হয়ে তিনি পিতৃগৃহে ফিরে আসেন।—এরপর থেকে মাতঙ্গিনী হাজরা বিভিন্ন সেবামূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। একাধিকবার তাঁকে ব্রিটিশ সরকার গ্রেফতারও করেন। ১৯৪২ সালে 'আগস্ট-আন্দোলনে' তাঁর সক্রিয় ভূমিকা কোনোদিনই বিস্মৃত হবার নয়। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে ১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের তমলুক আদালত প্রাঙ্গণে ইংরাজ পুলিশের গুলিতে বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা নিহত হন।]

১৯৪২ সালের আগস্ট মাস। সমগ্র ভাবতবর্ষ জুড়ে সে এক প্রবল আলোড়ন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী গান্ধীজীর নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে সামিল হয়েছে দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতা। সবার মুখে এক রব 'ইংরাজ তুমি ভারত ছাড়ো'। সমবেত কণ্ঠে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে দৃপ্ত ঘোষণা উচ্চারিত হ'ল, যদি তারা স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষ ত্যাগ না করে চলে যায়, তবে ব্যাপকভাবে দেশ জুড়ে আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হবে।

এর ফলে ব্রিটিশ সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে দেশের জনসাধারণের ওপর

তাদের অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল।—নেটিভদের মুখে এত বড় কথা!—এরা এত সাহস পায় কোথা থেকে! এদের আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতেই হবে!—সুতরাং ইংরাজ সরকার কালবিলম্ব না করে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করে গান্ধীজী সহ অন্যান্য নেতাদের গ্রেফতার করল।

শাসক সম্প্রদায় ভেবেছিল, নেতাদের গ্রেফতার করলে সাধারণ মানুষ কিংবা যে দু-একজন নেতা এদিক-ওদিক আত্মগোপন করে আছে, তাঁরা বৃহৎ আন্দোলনে নামতে সাহস পাবে না।

হায়! ব্রিটিশরাজ সেদিন ভারতবাসীকে চিনতে ভুল করেছিল। ভারতবাসীর দেশজননী যে বিদেশীর হাতে নির্যাতিতা। সে বেদনা প্রত্যেকের হৃদয়ে দাউ-দাউ করে জ্বলছে। তাই দেশের বড় বড় নেতাদের ইংরাজ সরকার গ্রেফতার করে আগুনে যেন ঘি দিল। দেশের প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ তাঁদের শ্রদ্ধেয় নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। তাঁরা সরকারী অফিসে আগুন ধরিয়ে দিলেন, সরকারের কোষাগার লুঠ করলেন। ডাকঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। তাঁরা রেল-লাইন উপড়ে ফেললেন বিভিন্ন জায়গায়, কলকাতার রাজপথে ট্রাম-বাসে আগুন ধরিয়ে দিলেন। —সারা দেশের সঙ্গে এই আন্দোলনের ঢেউয়ে উত্তাল হয়ে উঠল গ্রাম বাংলাও।

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমাও পিছিয়ে নেই। তমলুক আন্দোলনে আলোড়িত। মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা স্থির করেছেন একসঙ্গে মহিষাদল, সুতাহাটা এবং তমলুক থানা আক্রমণ করে দখল করতে হবে।

১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর, ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। সকাল থেকেই হাজার হাজার নর-নারী সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতো শোভাযাত্রা করে এগিয়ে চলেছে তমলুক থানার দিকে। তাঁদের উদ্দেশ্য তমলুক থানা ও আদালত দখল করা।

সব থেকে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বিপুল জনতার শোভাযাত্রাটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন একজন তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা। ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন মিছিলের পুরোভাগে। উন্মাদনায় তিনি যেন বৃদ্ধা নন, তাঁর যৌবনের দিনগুলি ফিরে পেয়েছেন। বৃদ্ধার কণ্ঠে বারংবার উচ্চারিত হচ্ছে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি। শোভাযাত্রার সকল নর-নারীর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় 'বন্দে মাতরম্'।

বৃদ্ধা দ্বিগুণ উৎসাহে তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠেন, 'ইংরাজ তুমি ভারত ছাড়ো।'

এগিয়ে চলেছে শোভাযাত্রা তমলুক থানা ও আদালতের প্রাঙ্গণের উদ্দেশ্যে।—সে এক দুর্বার প্রবাহ। সমুদ্র যেন তার উত্তাল তরঙ্গরাশি নিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছে। আর এই উত্তাল জন সমুদ্রকে দলনেত্রী সেই বৃদ্ধার প্রবল স্বদেশপ্রীতি ও প্রেরণা যেন আরও তরঙ্গময় করে তুলেছে।

হিংস্র পশুর মতো থাবা উঁচিয়ে ইংরাজ সরকারের সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী শোভাযাত্রাকে প্রতিহত করতে এসে অবাক বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায়।—একি!—এত বড় শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন একজন বৃদ্ধা! এই বয়সে এত প্রাণশক্তি কোথা থেকে পেল এই গ্রাম্যবৃদ্ধা!

মুহূর্তের বিভ্রম কাটিয়ে সশস্ত্র পুলিশ গর্জে ওঠে। মিছিলকে প্রতিরোধ করার জন্য সশস্ত্র পুলিশবাহিনী সক্রিয় হয়ে ওঠে।

সাময়িকভাবে ব্যাহত হয় শোভাযাত্রার গতি। কিন্তু বৃদ্ধা দলনেত্রী অবিচল। অগণিত নরনারীর উদ্দেশ্যে বৃদ্ধা উচ্চকণ্ঠে বলেন, "ভয় পেয়ো না ভাইসব। আমাদের কিসের ভয়? আমরা আর তো অন্যায় কিছু করছি না। আমাদের দেশমাতাকে আমরা আর বিদেশীর হাতে বন্দী থাকতে দেবো না। আমরা ইংরাজ সরকারকে মানি না। আমরা প্রাণ দেব, তবুও বিদেশী শাসকদের অত্যাচার আর সহ্য করবো না। আমাদের আজকের বীজমন্ত্র "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।"

বৃদ্ধা নেত্রীর আহ্বানে সকলেই যেন ফিরে পেল অসীম সাহস ও উদ্দীপনা। মিছিল আবার এগিয়ে চলল।

এবারে আর বৃটিশ পুলিশ থেমে থাকল না। ফটাফট্ লাঠি চালাতে লাগল জনতার ওপর। বৃদ্ধাও পুলিশের লাঠির ঘা থেকে রক্ষা পেলো না।

পুলিশের লাঠিকে উপেক্ষা করে শোভাযাত্রা আরও এগিয়ে চলল। সশস্ত্র পুলিশবাহিনী লাঠি চালিয়েও পারে না গতি রোধ করতে। এবারে তারা গুলি ছুঁড়তে লাগল। মিছিলের প্রথম সারির কয়েকজন যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

মায়ের প্রাণে এ দৃশ্য ক্ষত সৃষ্টি করে। চীৎকার করে বৃদ্ধা যুবকদের বলেন, "আমি মায়ের জাত। আমি বলছি দেশমাতার জন্য তোদের প্রাণ উৎসর্গ করে ধন্য হ' তোরা।"

এবারে মিছিলের একেবারে প্রথমে পতাকা-হাতে বৃদ্ধা নেত্রী এগিয়ে চলছেন।—এই তো থানা আর আদালত। আর দেরী নয়। দখল নিতে হবে থানা ও আদালতের! সহসা একটি গুলি এসে লাগে বৃদ্ধার বাঁ-হাতের কনুইতে। ক্ষতস্থান দিয়ে ঝর ঝর করে রক্তপাত ঘটতে থাকে। তবুও দমিত হন না বৃদ্ধা।—দেবী চণ্ডী যেন দানব-নিধনে মেতে উঠেছেন, এমনই ত তাঁর। ডান হাতে জাতীয় পতাকা ধরে এগিয়ে যান আরও সামনে।

এবার আর হাতে নয়, নিষ্ঠুর ইংরাজ পুলিশবাহিনীর নিক্ষিপ্ত একটি গুলি এসে লাগে বৃদ্ধার গলায়। রক্তের নদীতে ভাসতে ভাসতে বৃদ্ধা বীরাঙ্গনা মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। সেই মুহূর্তেও একবারের জন্য উচ্চারিত হ'ল তাঁর কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি। তখনও জাতীয় পতাকা বৃদ্ধার হাতে শক্ত মুঠিতে ধরা রয়েছে।

দেশজননীর পাদমূলে নিবেদিত প্রাণ এই বীরাঙ্গনা বৃদ্ধার নাম মাতঙ্গিনী হাজরা। বিপ্লবী ও স্বেচ্ছাসেবকদের অতি আদরের মাসিমা।

মাতঙ্গিনী হাজরা মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার হোগলা

গ্রামে এক সাধারণ চাষী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সাল ও তারিখ নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। কেউ-কেউ বলেন তিনি ১৮৭০ সালে জন্মেছিলেন, আবার কেউ বলেন ১৮৮০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাতঙ্গিনীর বাবার নাম ঠাকুরদাস মাইতি এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী।

শৈশবে অধিকাংশ গ্রাম্য চাষী-পরিবারের সন্তানের মতো লেখা-পড়া শেখার কোনো সুযোগ হয়নি মাতঙ্গিনী দেবীর। তাঁর অল্প বয়সে বিয়ে হয় পাশের আলিনাম গ্রামে। স্বামীর নাম ত্রিলোচন হাজরা। কিন্তু মাত্র আঠারো বছর বয়সে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ীতে ফিরে আসেন। এরপর বিভিন্ন সেবামূলক কাজে তাঁর যৌবন ও প্রৌঢ়কাল কাটে।

এই সময়ে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছে। এমন সময়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর আহ্বান গ্রামে-গঞ্জে এসে পৌঁছে। মাতঙ্গিনী দেবী সেই আহ্বানে সাড়া দেন। গ্রহণ করেন গান্ধীজীর শিষ্যত্ব! চরকা কাটা শুরু করেন। অনেক সময়ে বিপ্লবীরা তাঁর কাছে এসে আত্ম-গোপন করে থাকেন। বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। একাধিকবার তাঁকে ব্রিটিশ সরকার গ্রেফতার করেন। তবুও তিনি এতটুকুও মুষড়ে পড়েন না। যেন দেশের স্বাধীনতার জন্য 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'—এই সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন।

এলো ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লব। সমগ্র দেশ জুড়ে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়েছে। মাতঙ্গিনী হাজরাও সক্রিয়ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে। অবশেষে ২৯শে সেপ্টেম্বর তমলুক আদালতের সামনে ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে নিজের জীবন সঁপে দিলেন এই বরেণ্য নারী মাতঙ্গিনী হাজরা।

বিপ্লবী কিশোর টেগরা

[কিশোর শহীদ টেগরা বল চট্টগ্রামের বিপ্লবী লোকনাথ বলের কনিষ্ঠ ভাই, ডাকনাম সোনাভাই। টেগরা মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে মাষ্টারদার কাছে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেন। একগুঁয়ে, জেদী এবং সাহসী এই কিশোর ছিলেন খাপ-খোলা তলোয়ার। বাঙালীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের দায়ে এই বয়সেই একজন ফিরিঙ্গিকে ঘুষি মেরে রাস্তায় শুইয়ে দিয়েছিলেন। জালালাবাদের যুদ্ধে ইংরেজের গুলিতে টেগরা নিহত হন।]

জালালবাদ পাহাড়ের অতন্দ্রপ্রহরী কিশোর বিপ্লবী টেগরা বল। চট্টগ্রামের বিপ্লবী শিক্ষক সূর্যসেনের কাছে মাথা নত ক'রে দাঁড়িয়ে। —আমিও বিপ্লবীদের সাহায্য করবো।

মাষ্টারদা বললেন, তোমার তো এই সবে চোদ্দ বছর বয়স। তুমি কি কাজ করবে?

ঋজু দেহে সগর্বে উত্তর দিলো টেগরা, 'অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আগের কাজ আমি করবো, টেলিগ্রামের তার কাটবো। কারখানার ভেতর ঢুকে গুঁড়িয়ে দেব। অস্ত্রাগারের ভিতর ঢুকে দরজা খুলে দেব। আমি বালক, আমাকে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনবে না।'

সূর্য সেন এক দৃষ্টে তাকিয়ে দেখেছিলেন, তাঁর সেনাপতি লোকনাথ বলের সোনা ভাই টেগরাকে। মনে মনে ভেবেছিলেন, হ্যাঁ, এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গই চাই।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হ'লো পরিকল্পনা মতো ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল। ইতিহাসের পাতায় রাঙা হ'য়ে উঁকি দিচ্ছে একটি কিশোর। ভারি একগুঁয়ে, জেদী এবং সাহসী। যেন খাপ-খোলা

তলোয়ার। অমন গুরুগম্ভীর ভারি মেজাজের যুবক লোকনাথ বলও ভয় খায় তার ছোট্ট সোনা ভাইকে।

অধিনায়ক সূর্য সেনকে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সাফল্যের পর অভিবাদন করে টেগরা বললো, প্রোগাম দিন মাষ্টারদা।

মাষ্টারদা যেন আত্মনিমগ্ন হলেন। এক মায়ের কোল থেকে দুটি সন্তানই কি চট্টলামাতা ছিনিয়ে নেবেন?

ভার পড়লো, লুণ্ঠিত অস্ত্র নিয়ে চট্টগ্রাম শহরকে দখল করতে হবে, ওড়াতে হবে সরকারী ভবনের চূড়ায় জাতীয় পত্রিকা।

চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীরা তখন স্বাধীন চট্টগ্রামের স্বপ্নে বিভোর। রাতের অন্ধকারে বিপ্লবীরা আশ্রয় নিলো জালালাবাদ পাহাড়ে। মনে তাদের দুর্জয় সাহস, বুকে বল, দেহে অগ্নি-উদ্যম।

বিকালে খবর এলো, ট্রেনে ক'রে ফিরিঙ্গি ফৌজ সঙ্গে মারাত্মক আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে গোটা জালালাবাদ ঘিরে ফেলেছে। অধিনায়ক সূর্য সেন হুকুম দিলেন, গুলি করো। জালালাবাদের কঠিন পাথরে আছড়ে পড়লো বিপ্লবীদের আগুন ঝরানো ধ্বনি,—বন্দে মাতরম্, চট্টলামাতা কি জয়···যুদ্ধ শুরু হ'লো। একদিকে বিপ্লবীদের বন্দুকের গুলি···অন্য দিকে ফিরিঙ্গি ফৌজের লুইসগান।···

সমস্ত চট্টগ্রাম যেন কেঁপে উঠলো।

ব্রিটিশ তিনদিক থেকে জালালাবাদ পাহাড় ঘিরে ফেলেছে। বিপ্লবীরা দমে যাবার ছেলে নয়।

চোদ্দ বছরের কিশোর টেগরা সঙ্কীর্ণ একটি গিরিখাতে শুয়ে পড়ে গুলি চালাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগেই লোকনাথ বলে গেছেন, 'সোনা ভাই এই পথ তুই ইংরেজকে ছেড়ে দিবি না। শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবি।'

বিপ্লবীরা তিন মুখো-হ'য়ে জবাব দিতে লাগলো, গুলিবর্ষণে। হঠাৎ একটা গুলি এসে বিঁধলো টেগরার বুকে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। বাঁ হাতে ক্ষতস্থান চেপে ধরে ডানহাতে তবু গুলি বর্ষণ করে চলেছে কিশোর টেগরা।

আর কতক্ষণ লড়বে টেগরা! বেশ কয়েকটা ইংরেজকেও খতম ক'রেছে। ও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে তবু শত্রুকে পথ ছাড়েনি হাতের রাইফেলটা তুলে ধ'রে শেষ কথা বলে ছিলো।' "মাষ্টারদা, সোনা ভাই পথ ছাড়েনি।"

জালালাবাদ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় হলদিঘাট। শহীদ টেগরা বলের দেহকে ঢেকে দেওয়া হ'লো তে-রঙা ঝাণ্ডা দিয়ে, না ছিল ফুল, না ছিল মালা। শুধু কয়েক ফোঁটা চোখের জল আর বুকের দীর্ঘশ্বাস—তাই দিয়ে শেষ হ'লো টেগরার তর্পণ।

এই অমর বীর কিশোর টেগরার মর্মবাণী ছড়িয়ে আছে চট্টগ্রামের এই জালালাবাদ পাহাড়ে।

ইতিহাসের রক্তমাখা এক করুণ মর্মস্পর্শী কাহিনীও স্বাধীনতা সংগ্রামের জ্বলন্ত অধ্যায়।



বিপ্লবী সত্যেন বসু

[সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর শহরে। গ্রামের পড়া শেষ করে কলকাতা সিটি কলেজে বি. এ. পড়তে ভর্তি হন। সেই সময়ই শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি গঠিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ বিপ্লবী সমিতির সংস্পর্শে আসেন ও বিপ্লবী ভাবধারায় নিজেকে প্রস্তুত করেন। পরে মেদিনীপুরের কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যার অপরাধে সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসী হয় ১৯০৮ সালে ২৩শে নভেম্বর।]

মেদিনীপুর বিপ্লবী সন্তানের স্বর্ণপ্রসবিনী।

রাজনারায়ণ বসুর ভাইপো সত্যেন বসু ছিলেন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক। কলকাতায় সিটি কলেজে বি. এ. পড়বার সময় গুপ্ত বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। পড়ার কাজ শেষ করে মেদিনীপুরে শিক্ষকতা গ্রহণ করলেন এবং শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য হিসাবে ওখানেই গড়ে তুললেন "বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি।" ১৯০৪ সালে ক্ষুদিরামের ভগ্নিপতি অমৃতলাল বসু মেদিনীপুরে বদলী হ'লে ক্ষুদিরামও দিদির সঙ্গে এখানে আসেন।

স্কুলের শিক্ষক সত্যেনবসুকে গুরুর পদে বরণ করলেন ক্ষুদিরাম। গুরু সত্যেন পেলেন উপযুক্ত শিষ্য ক্ষুদিরামকে।

বিপ্লবের হোমাগ্নিতে আহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন গুরু সত্যেন। মেদিনীপুরের বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিতে চললো তরুণদের লাঠি

খেলা, বন্দুক চালনা, অসিযুদ্ধ। যুবকদের নিয়ে মেতে উঠলো দেহচর্চ্চা, ব্যায়াম, শারীর প্রদর্শনীতে।

ব্রিটিশের নজরে পড়লো সত্যেন। চোখে চোখে রাখলো এই বিপ্লবী শিক্ষককে।

মেদিনীপুরে মেলা বসেছে। সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশে সেখানে নিষিদ্ধ ব্রিটিশ-বিরোধী পুস্তক বিতরণের একটি স্টল বসালো ক্ষুদিরাম। পুলিশ সত্যেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা নিয়ে এলো, তছনছ করলো স্টল, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথকে ধরতে পারলো না। সত্যেন পলাতক।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে সত্যেন্দ্রনাথ বসু জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যবাদিতা ও অমায়িক মৃদুভাষী সত্যেনকে তাই সবাই ভালো বাসতো, শ্রদ্ধা করতো। সত্যেনের মনে ধিকি ধিকি করে জ্বলতো মুক্তি-যজ্ঞের আগুন।

কিংসফোর্ডকে হত্যার দায়ে ক্ষুদিরাম ব্রিটিশের হাতে ধরা পড়েন। ইংরেজ বুঝে নিলো এর পিছনে হাত আছে বিপ্লবী দলের, হাত আছে গুরু সত্যেনের। তাই কলকাতার বিপ্লবী সমিতির অফিসে অতর্কিতে হানা দিয়ে পুলিশ সত্যেন্দ্রনাথকে গ্রেফতার করলো। এই সংবাদ বিপ্লবী দলের নরেন গোঁসাই বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজকে বলে দেয়।

জেলে বসে বিপ্লবী সত্যেন ও বন্ধু কানাইলাল নরেন গোঁসাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতার কথা সব শুনলেন।

প্রতিজ্ঞা করলেন বেইমানির প্রতিশোধ চাই।

ইংরেজ বুঝতে পারলো নরেনকে বাইরে রাখলে বিপ্লবীরা মেরে ফেলবে। তাই তাকে নিরাপদ স্থান জেল হাসপাতালে রেখে দেওয়া হ'লো। সত্যেনের হাঁপানীর অসুখ ছিল।

চিকিৎসার জন্য সত্যেনকেও জেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'লো। সত্যেন ভাবলেন মনে মনে, এই সুযোগ।

সতেন্দ্রনাথ চিকিৎসককে বললেন, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আমি আর এখানে থাকতে পারছি না। আমি বিপ্লবীদের সমস্ত খবর ব'লে দেব।

জেলের পুলিশকর্তাদের আর আনন্দ ধরে না। এতদিনে পুরস্কারের মোটা অংক এবার তার মুঠোয়।

সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, নরেনকে একবার দেখবো, কিছু পরামর্শ করতে হবে। নইলে আমাকেও বিপ্লবীরা মেরে ফেলবে।

পুলিশের বড়কর্তা আত্মহারা হ'য়ে নরেনকে নিয়ে এলো সত্যেনের কাছে।

নরেনকে দেখেই সত্যেন্দ্রনাথের লুকিয়ে-রাখা রিভ্‌লবার গর্জে উঠ্‌লো। পরপর কয়েকটি গুলিতে নরেন গোঁসাইয়ের দেহ ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেল। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি পেল নরেন। তারপর সারা বাংলা শুনলো—বিচারের নামে প্রহসন। বিচারে সত্যেন বসুর ফাঁসির আদেশ দেওয়া হ'লো। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিয়ে আত্মবলিদান দিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর সত্যেন্দ্রনাথ।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে নভেম্বর সেই স্মরণীয় দিন। ফাঁসির দড়ি গলায় পরে জীবনের জয়গান গাইলেন মুক্তিযজ্ঞের অগ্নিপুরোহিত বীর সত্যেন্দ্রনাথ।

বীর বিপ্লবী বসন্ত

[চন্দননগরের ছেলে বসন্ত বিশ্বাস। কলেজে পড়ার সময় রাসবিহারী বসুর সংস্পর্শে আসেন ও বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেন। রাসবিহারী ছিলেন তাঁর গুরু। গুরু-শিষ্যে দিল্লীতে আসেন ও লর্ড হার্ডিঞ্জের শোভাযাত্রায় বোমা নিক্ষেপ করেন। পরে লাহোরে লরেন্স বাগানে গর্ডনকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। বিচারে বসন্তর মৃত্যুদণ্ড হয়।]

১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর।

ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হ'লো দিল্লীতে। সেখানে বসছে ব্রিটিশদের উৎসবের মেলা। শোভাযাত্রায় অংশ নিতে আসছেন স্বয়ং বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ, তিনি পুরোভাগে থেকে উৎসবের শোভা বর্ধন করবেন।

বাংলার বিপ্লবী দল গর্জে উঠলো। এইতো সুযোগ।

দিল্লীতে গোপন বৈঠক বসলো।—আমির চাঁদ, কিঙ্গলে, রাসবিহারী, আরও অনেকে। পরিকল্পনা করলেন রাসবিহারী। ডাক দিলেন—কে আছো তরুণ বিপ্লবী। শোভাযাত্রার পুরোভাগে লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে হবে, চূর্ণ করতে হবে প্রভুত্ব করার আকাঙ্ক্ষাকে।

একজন তরুণ উঠে দাঁড়ালেন।—আমি পারি জীবন দিতে আর জীবন নিতে। মৃত্যু আমার খেলার সঙ্গী।

সেই তরুণের নাম বসন্ত বিশ্বাস।

শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে। রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ। জনতার মধ্যে মিশে গেলেন বসন্ত, ঝোলায় তেজী বোমা। সবার চোখ শোভাযাত্রার দিকে। বসন্ত তখন সুবেশা তরুণী! এমন

সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে আকাশ, বাতাস কেঁপে উঠলো। কেঁপে উঠলো রাজপথ, মানুষ জন।

গাড়ির চালকের দেহ ছিন্নভিন্ন হ'লো। অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। তিনি মূর্চ্ছিত।

ইংরেজ সৈন্যরা ঘিরে ফেললো রাস্তায় দাঁড়ানো জনতাকে, তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হ'লো। কিন্তু বসন্ত তখন ব্রিটিশের চোখের বাইরে। আক্রমণ ব্যর্থ হ'লো বিপ্লবীরা চলে গেলেন লাহোরে। সেখানে গোপন বৈঠক বসলো।

ব্যর্থ বসন্ত এবার ভার নিলেন লাহোরের লরেন্স গার্ডেনে ব্রিটিশ শাসকরা এলে তাদের লক্ষ্য ক'রে বোমা নিক্ষেপ করার।

১৯১২ সালের ১৩ই মে।

লাহোরের লরেন্স গার্ডেনে একটা তেজী বোমা লুকিয়ে রাখলো বসন্ত বিশ্বাস। লাহোরের ম্যাজিস্ট্রেট গর্ডন আসবেন এখানেই। বোমাটি ছিল টাইম বোমা। গর্ডন সাহেব বাগান থেকে চলে যাবার পর বোমাটি ফাটে, নিহত হয় গর্ডনের চাপরাসী।

কয়েক মাসের ব্যবধানে পর পর দুটি হত্যাকাণ্ডে ব্রিটিশ ক্ষেপে যায়। লাহোরের বিপ্লবীদের গুপ্ত আস্তানা তছনছ ক'রে কাগজপত্র থেকে রাসবিহারী বসু ও বসন্ত বিশ্বাসের নাম জানতে পারে। এদের ধরবার জন্য প্রচুর টাকা পুরস্কার ঘোষণা করল ইংরেজ সরকার। অবশেষে বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্যে বসন্ত ধরা পড়লেন ইংরেজদের হাতে।

বিচার শুরু হ'লো! বিচারের নামে প্রহসন। দিল্লীতে বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষেপ ও লাহোরে গর্ডনকে হত্যার চেষ্টার জন্য বসন্তকে অভিযুক্ত করলো ইংরেজ। শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, ফাঁসী। নির্ভীক বসন্ত আদালতে হাসিমুখে স্বীকার করলেন, মায়ের শৃঙ্খলমোচনই তার লক্ষ্য, মিথ্যা কথা বলা নয়। তাই যা সত্য, তাই তিনি বলেছেন। বসন্ত একথাও বললেন, 'আমার দুঃখ যে লাট সাহেবদের একজনকেও আমি মারতে পারলাম না।' মৃত্যুঞ্জয়ী বীর বসন্ত হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করলেন।



বঙ্গবন্ধু মুজিবর

[বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান ঢাকার এক সাধারণ বাঙালি মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মনে মনে বিপ্লবী অহিংসায় বিশ্বাসী গান্ধীজির ভাবশিষ্য। ধর্ম ও সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি থেকে মুক্তি মুজিবর জাতীয়তাবাদী "আওয়ামী লীগ" নামে এক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল তৈরি করেন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন।]

১৯৪৭ সালের রক্তিম প্রভাত।

দিল্লীর লাল কেল্লা থেকে নেমে এলো সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ ইউনিয়ন জ্যাক। সেখানে উঠ্‌লো তেরঙা ঝাণ্ডা। আর করাচিতে উঠ্‌লো চাঁদ-তারা নিশান।

ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান জন্ম নিলো দুটি রাষ্ট্র। ব্রিটিশের চক্রান্তের ফসল।

মুসলমান ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্টি হ'য়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের। এক-দিকে পূর্বপাকিস্তান ও অন্যদিকে পশ্চিমপাকিস্তান। মাঝখানে ভারতবর্ষ —বারোশ মাইলের ব্যবধান। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির নেই। পূর্বপাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিমপাকিস্তানের কোন মিল ছিল না, না ভাষায়, না সংস্কৃতিতে, না মানসিকতায়। একটিতে শুধু মিল—উভয় দেশই

মুসলমান ধর্মাবলম্বী। কিন্তু ধর্ম কি কেবল দু দেশের মেলবন্ধন করতে পারে ?

যাদের উর্বর মস্তিষ্কে এর জন্ম, তারা পূর্ববঙ্গের মানুষকে বুঝিয়েছিল, পাকিস্তান রাজ্য হলে তারা হাতে স্বর্গ পাবে। সমস্ত দুঃখের অবসান হবে—সর্বস্তরে আসবে সুখ ও সমৃদ্ধি। কিন্তু ভুল ভাঙলো কিছুদিন বাদেই। যখন পূর্ববঙ্গের মানুষ দেখলো, ব্রিটিশের খপ্পর থেকে বেরিয়ে তারা ইস্পাহানী আর খান সাহেবদের খপ্পরে পড়েছেন। স্বাধীন হবার নামাবলী গায়ে দিয়ে নূতন ক'রে এই দেশটা পরাধীন হ'য়ে গেছে। ধর্মের বেড়াজালে আবদ্ধ রেখে পূর্ববঙ্গে শোষণ করছে পশ্চিমপাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। শস্যশ্যামলা পূর্ববাংলার সোনার ফসল লুণ্ঠন ক'রে নিতে লাগলো। ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপরও চললো আক্রমণ। আর সহ্য করা যায় না, একটা কিছু করতে হয়। ততক্ষণে গণতন্ত্রী দল গঠিত হয়েছে—আওয়ামী লীগ। আশ্চর্য মুসলিম শব্দটাই নেই। অন্ধ ধর্মের নির্মোক ত্যাগ ক'রে উদয় হলেন বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান। খাঁটি বাঙালী। পূর্ববঙ্গের অবিসংবাদী নেতা গান্ধীজির ভাবশিষ্য। তাঁর গুরু কিন্তু বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী।

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন স্বাধীন বঙ্গের। ধর্মের নামে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে এবং তার সম্পদকে লুণ্ঠন করতে দেওয়া হবে না। তিনি দল গড়লেন—পূর্ববঙ্গের মানুষকে আহ্বান জানালেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার।

নির্বাচন হ'লো, বিপুলভাবে বঙ্গবন্ধু জিতলেন। কিন্তু পাকশাসক ইয়াহিয়া তার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে দিলেন।

মুজিবর গণতন্ত্রের সিংহাসনে বসার আগেই পশ্চিমপাকিস্তান থেকে সামরিক বাহিনী এসে দেশটাকে ঘিরে ফেলে—এবং আওয়ামী লীগের নেতাদের গ্রেপ্তার করতে থাকে।

বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্রের পথ পরিত্যাগ ক'রে সংগ্রামী বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তুললেন মুক্তি-বাহিনী। সশস্ত্র অভিযান।

"কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙে ফেলে করবে লোপাট—"

বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী সন্তানদের সঙ্গে পশুশক্তি ইয়াহিয়া বাহিনীর চললো মরণপণ সংগ্রাম।

২৬শে মার্চ ১৯৭১। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পাকপ্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া বাহিনী। শুরু হয় ঢাকায় গণহত্যা। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গুপ্তস্থান থেকে বেতার কার্যে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। অতর্কিতে পাকিস্তান ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। ভারতের বীর সেনারা পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে পাকহামলার মোকাবিলা করে।

অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১। ভারতের লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে ঢাকায় পাক সেনাপতি নিয়াজী আত্ম-সমর্পণ করে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান হলেন বঙ্গবন্ধু মুজিবর। শতশহীদের রক্তে রাঙা বাংলাদেশ জন্ম নিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে।

গ্রাম বাংলার সংগ্রামী নেতা
বীর তিতু মীর

[বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামের সংগ্রামী কৃষক নেতা ছিলেন। তিতু মীর। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মীর নিসার আলি। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন নদীয়া জেলার জনৈক জমিদারের কর্মচারী। একবার কারারুদ্ধও হন তিনি। তিতু মীর ব্রিটিশ বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন।]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক নানা কারণে বাংলার জেলাগুলিতে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন দেখা দেয়। জমিদার ও নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুস্‌লিম প্রজাগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ইংরেজ সরকার অত্যাচারী জমিদার ও সাহেবদের পক্ষ নিলে সংস্কারপন্থী ওয়াহাবীরা ব্রিটিশের বিরোধিতায় লিপ্ত হন।

ইস্‌লাম ধর্মমতে অমুসলমানদের রাজ্য দোর্-উল্-হার্ব্য মুসলমানদের বাসের অযোগ্য। সুতরাং বিধর্মী ইংরেজদের বিতাড়িত করা ওয়াহাবী মুস্‌লিমদের প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। অত্যাচারী জমিদার ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এই সময় গ্রাম বাংলার যে কয়েকজন মুস্‌লিম নেতা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কৃষক নেতা তিতু মীর-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

তিতু মীরের প্রকৃত নাম ছিল মীর নিসার আলি। তিনি ছিলেন বারাসাতের ৩০ মাইল পূর্বে বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামের অধিবাসী। কর আদায়ে স্থানীয় জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে

তিতু মীর ২৪ পরগণা যশোর, নদীয়া ও ফরিদপুর প্রভৃতি কয়েকটি নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত জেলে, তাঁতী এবং অন্যান্য দরিদ্র কৃষকদের উত্তেজিত করে পল্লী অঞ্চলে এক আলোড়ন গড়ে তোলেন।

প্রথম জীবনে তিতু মীর ছিলেন নদীয়া জেলার জনৈক জমিদারের অধীনে সামান্য কর্মচারী। কিন্তু একজন দুর্ধর্ষ লেঠেল (লাঠিয়াল যোদ্ধা) রূপে তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সরকারের বিরোধিতা করায় তিতু মীর একবার কারাবরণও করেন। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি দিল্লীর বাদশাহী পরিবারের সঙ্গে মক্কায় হজ করতে যান। ওয়াহাবী নেতা সৈয়দ আহ্মদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিতু মীর তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মক্কা থেকে ফিরে (১৮২৭ খ্রীঃ) তিনি প্রথমে কিছুদিন ওয়াহাবী মতবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। পরে তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগী গুলাম রসুলের সহায়তায় কয়েক শত অনুগামীকে সামরিক কায়দায় প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন এবং অত্যাচারী জমিদার ও কুঠিয়াল সাহেবদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হন।

২৪ পরগণা জেলার নারকেল বেড়িয়াতে তিতু মীর তাঁর সদর কার্যালয় স্থাপন করেন। সেখানে একটি সুদৃঢ় বাঁশের কেল্লাও তিনি নির্মাণ করেন। অতঃপর পাঁচ শতাধিক অনুচর নিয়ে তিতু মীর জমিদারের লোকজনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। বিভিন্ন সংঘর্ষে জয়লাভ করে তিতু মীর সাহসী হয়ে ওঠেন এবং "বৃটিশরাজের অবসান ও অপহৃত মুস্‌লিম সার্বভৌমত্বের পুনঃস্থাপন" ঘোষণা করেন। তিতুর অনুগামীরা জমিদারদিগের কাছারী ও নীলকর সাহেবের বিভিন্ন কুঠি লুঠপাট করে চারদিকে ত্রাসের সৃষ্টি করে। সাহেবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তিতু মীর নদীয়া, ২৪ পরগণা ও ফরিদপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় নিজের কর্তৃত্ব প্রমাণিত করেন।

তিতু মীরের কার্যকলাপের সংবাদ কলকাতায় পৌঁছলে আলেক-জাণ্ডার নামে লবণ কুঠির এক সাহেবকে একদল সৈন্যসহ তাঁর বিরুদ্ধে

পাঠান হয়। কিন্তু এই সেনাদল সহজেই পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। কলকাতা থেকে আগত বাহিনীর জমাদার, বেশ কিছু সিপাহী ও বরকন্দাজ নিহত হয়। বসিরহাটের দারোগা ও কলিঙ্গ থানার জমাদার আহত ও বন্দী হন। আলেকজাণ্ডার কোনক্রমে পালিয়ে রক্ষা পান। একাধিক নীলকুঠির ইউরোপীয় ম্যানেজার তিতু মীরের অনুগামীদের হাতে বন্দী হন।

আলেকজাণ্ডারের নিকট বিদ্রোহের বিবরণ শুনে কল্‌কাতার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তিতু মীরের বিরুদ্ধে ১০ রেজিমেণ্ট দেশীয় পদাতিক সৈন্য এবং বেশ কিছু অশ্বারোহী গোলন্দাজ সৈন্য প্রেরণ করেন। ওয়াহাবীগণ যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত হয়ে দুর্গের সম্মুখে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেন কিন্তু সুশিক্ষিত ব্রিটিশ সেনার সম্মুখে তাঁরা বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলেন না। যুদ্ধে তিতু মীর নিহত হলেন। তাঁর সহযোগী গুলম রসুল ৩৫০ জন অনুগামীসহ বন্দী হলেন (নভেঃ ১৮৩১)। পরে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। তাঁর ১৪০ জন অনুচরকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

এই ভাবেই বাঙালী বীর তিতু মীরের স্বল্পস্থায়ী ব্রিটিশ-বিরোধিতার অবসান হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তিতু মীরের সংঘর্ষকে "বাংলাদেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য প্রথম সংগ্রাম রূপে বর্ণনা করেছেন। জনৈক লেখকের মতে তিতু মীরের নেতৃত্বে জমিদার, নীলকরদের ও সাহেবদিগের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষকদিগের এই বিরোধিতার গুরুত্ব একবারে উপেক্ষনীয় নয়। তিতু মীরের ব্রিটিশ বিরোধিতার দুইটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখযোগ্য ইংরেজের অধীনে চাকরি করতে জনগণের অসম্মতি এবং ব্রিটিশ আদালতে যেতে তাঁদের অস্বীকার —পরবর্তীকালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বাভাস রূপে গণ্য হতে পারে।

— ——